EAST WEST UNIVERSITY
excellence in education

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা
ও
সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০১৮

৪ ডিসেম্বর ২০১৮, মঙ্গলবার, বিকাল ৩.৩০ মিনিট

এস. এম. নওশের আলী লেকচার গ্যালারী

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-১২১২

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০১৮

বিষয় ঃ সাহিত্য ও সমাজে নিম্নবর্গীয়তা: বৃত্তের ভেতরে জীবন

-ঃ অনুষ্ঠানসূচী ঃ-

বিকাল ৩:৩০ মিনিট ঃ অতিথিদের আসন গ্রহণ

বিকাল ৩:৩৫ মিনিট ঃ স্বাগত বক্তব্য
অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম
উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

বিকাল ৩:৪০ মিনিট ঃ সহপাঠীর স্মৃতিচারণ
নওশীন আহসান
এক্সেস টিচার, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফেসিয়েন্সি সেন্টার, ঢাকা

বিকাল ৩:৪৫ মিনিট ঃ সম্মানিত বক্তার বক্তৃতা
ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সাবেক অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিকাল ৪:৩০ মিনিট ঃ প্রধান অতিথির বক্তব্য
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

বিকাল ৪:৪০ মিনিট ঃ সভাপতির বক্তব্য
অধ্যাপক ড. এম. এম. শহীদুল হাসান
উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

বিকাল ৪:৫০ মিনিট ঃ আপ্যায়ন

নেহরীন খান পরিচিতি

নেহরীন খান
(১৯৭৭-২০১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আকবর আলি খান ও হামীম খান এর একমাত্র সন্তান নেহরীন খান ১৯৭৭ সালের ১২ জুলাই তারিখে কানাডার কিংস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে তার পিতা কিংস্টনের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য পড়াশুনা করছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

১৯৭৯ সালে বাবা মায়ের সাথে দেশে ফিরে নেহরীন খান ঢাকার সানবীমস স্কুলে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৯৮৭ সালে তার বাবা ড. আকবর আলি খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দুতাবাসে ইকনোমিক মিনিস্টার পদে বদলী হলে নেহরীনও চার বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানকার বেভারলি ফার্মস প্রাথমিক ও পোটোম্যাকের হার্বার্ট হুভার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরে 'ও' লেভেল সম্পূর্ণ করে 'এ' লেভেল পরীক্ষা দেন। এ পর্যায়ে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হন। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের শেষ পর্যায়ে নেহরীন খান এর বাবা বিশ্বব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে মনোনীত হন। তিনি বাবার সাথে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে (The American University at Washington D.C) ভর্তি হন এবং ২০০৫ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশে ফিরে পুনরায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন ঃ

নেহরীন খান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। এক সেমিস্টার পড়ানোর পর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) এ প্রভাষক

হিসেবে যোগ দেন এবং কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। ২০১৬ সালে তার অকাল মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ও শেক্সপেরিয়ান সাহিত্য পড়াতেন।

গবেষণা ঃ

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। বিশেষ করে অভিবাসীদের সাহিত্য নিয়ে- যে সাহিত্য অভিবাসী লেখকরা লিখেছেন এবং যে সাহিত্যে অভিবাসীদের জীবন প্রতিফলিত। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তার অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসী সাহিত্য। তিনি অভিবাসী সাহিত্যে ঘর (Home) সম্পর্কে ধারণা বিশেষ যত্নের সাথে পরীক্ষা করেছেন। অভিবাসীদের যেমন সারাটা জীবন ঘর খুঁজতে চলে যায় তেমনি নেহরীন খানের জীবনটাও ঘর খুঁজতেই চলে গেছে। কানাডায় জন্ম, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, দুই দফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ অবস্থান এ সব মিলিয়ে তিনিও অভিবাসীদের মতো সারা জীবন ঘর খুঁজে গেছেন।

বিশ্বাস ঃ

পিতামাতার প্রতি গভীর ভালবাসায় নেহরীন খান কানাডার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে একা থাকতে আগ্রহী ছিলেন না। তার বিশ্বাস ছিল, তার মা তাকে যে কোন বিপদ বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। ছোটবেলায় তাকে একটি গল্প শোনানো হতো, গল্পটা ছিল এরকম- একটি হাতির বাচ্চাকে দুষ্ট লোকেরা চুরি করে। নেহরীন একথা বিশ্বাস করে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, হাতির মা কি করলো? তার বিশ্বাস ছিল যে, হাতির বাচ্চার মা-বাবা নিশ্চয়ই তাদের বাচ্চাটিকে রক্ষা করবে। এ ধারণাটি অবশ্য ভুল। নেহরীন তার জীবন দিয়ে শিখে গেল বাবা-মা সব সময় তাদের সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না।

সম্মানিত বক্তার পরিচিতি

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জন্ম ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারি, সিলেট শহরে। তাঁর বাবা সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ছিলেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও শিক্ষক। তাঁর মা রাবেয়া খাতুনও ছিলেন শিক্ষক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালে সিলেট সরকারি পাইলট বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এস এস সি পরীক্ষায় পাস করেন এবং বিজ্ঞান বিভাগে এইচ এস সি পাস করেন ১৯৬৮ সালে, সিলেট এম সি কলেজ থেকে। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭২ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৭৩ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাস করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং যথাক্রমে পোপ মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক ও ফজলুর রহমান মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৬ সালে তিনি পিএইচডি গবেষণার জন্য কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৯৮১ সালে ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ডব্লিউ বি ইয়েটস-এর কবিতার ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের দর্শনচিন্তার প্রভাব'। ১৯৮৯ সালে তিনি ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে এক সেমিস্টারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাটিসবার্গস্থ ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ণ মিসিসিপিতে যান। ২০১৭ সালের জুন মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এবং ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এর আগে ২০০১ সাল থেকে দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুতিক্রমে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষকতা করেন।

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতি ও সিনেটের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের তিনি এক মেয়াদকাল ওয়ার্ডেন ছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটার ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনেও তিনি দীর্ঘদিন ইংরেজি সংসদীয় বিতর্কে স্পিকারের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানবিক গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। মীরপুরে ডিফেন্স স্টাফ কলেজে তিনি কয়েক বছর নিয়মিত গবেষণার ওপর ক্লাশ নিয়েছেন ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেছেন। তিনি থিয়েটার স্কুলে দীর্ঘদিন নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি পড়িয়েছেন। অধ্যাপক ইসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জার্নাল ও বাংলাদেশ আমেরিকান স্টাডিজ জার্নাল এর সম্পাদনা করেছেন ও ইংরেজি ভাষায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিক্স

সিজনস রিভিউ, বেঙ্গল লাইটস ও শিল্প বিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন যামিনী-র সম্পাদনা পরিষদে আছেন। তিনি বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য। তিনি লেখকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন পেন ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ কেন্দ্রের সভাপতি।

অধ্যাপক ইসলাম দৈনিক প্রথম আলো-তে একটি কলাম লেখেন, যার বিষয় সমাজ ও রাজনীতি। তাছাড়া দেশের অনেক সংবাদপত্রে তাঁর লেখা বের হয়। সংবাদ-এর সাহিত্য পাতায় দীর্ঘদিন তিনি লিখেছেন 'অলস দিনের হাওয়া' নামে বিশ্বসাহিত্য ভিত্তিক কলাম। তিনি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয়, সাহিত্যতত্ত্ব, কালচারাল স্টাডিজ, নিম্নবর্গীয় ইতিহাস, শিল্পকলা, বাংলা সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, অনুবাদতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলো দেশ-বিদেশের নানা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের শিল্পকলা নিয়ে ইংরেজিতে তিনটি বই লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি।

একাডেমিক লেখালেখির পাশাপাশি অধ্যাপক ইসলাম সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন। এ পর্যন্ত তার নয়টি গল্প সংকলন ও পাঁচটি উপন্যাস কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি দু'টি মঞ্চ এবং অনেকগুলি টিভি নাটক লিখেছেন। তাঁর মঞ্চনাটক ভূবনের ঘাটে-র জন্য তিনি বাচসাস পুরস্কার পান। তাঁর কিছু গল্পের ইংরেজিতে স্ব-অনুদিত একটি সংকলন ২০১৩ সালে ডেইলি স্টার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালে ভারতের একটি প্রকাশনা সংস্থা এই সংকলনের একটি পরিমার্জিত ও কিছুটা পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করে। লেখালেখির জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, প্রথম আলো বর্ষসেরা সৃজনশীল গ্রন্থ পুরস্কার, কাগজ সাহিত্য পুরস্কার, সমকাল-ব্র্যাক ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, কাজী মাহবুব উল্লাহ সাহিত্য পদক, লেখিকা সংঘ পদক, কথাসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার, মহাকবি মধুসূদন পুরস্কার, খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার ও সার্ক সাহিত্য পুরস্কার।

অধ্যাপক ইসলামের স্ত্রী সানজিদা ইসলাম স্বাস্থ্য যোগাযোগ ক্ষেত্রে কাজ করছেন। তাঁর একমাত্র সন্তান শাফাক ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে আইন পেশায় নিয়োজিত।

সাহিত্য ও সমাজে নিম্নবর্গীয়তা: বৃত্তের ভেতরে জীবন

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এ বছরের নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমাকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেজন্য তার স্মৃতিতে স্থাপিত তহবিল এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই তহবিলের প্রতিষ্ঠাতা ড. আকবর আলী খানকে আমি ১৯৭৬ সাল থেকে চিনি। ওই বছর আমি পিএইচডি গবেষণার জন্য কানাডার কিংস্টনের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, এবং ড. খানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল অর্থনীতি। পরিচয়ের শুরু থেকেই তাঁর পান্ডিত্য, অধীত বিষয়ের ওপর তাঁর অধিকার, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কুশলতা আমাকে মুগ্ধ করে। নেহরীনের জন্ম হয় ১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মে, এবং কিংস্টনের সকল বাঙ্গালির জন্য তা হয়ে ওঠে এক আনন্দময় ঘটনা। অনেক বছর পর নেহরীন যখন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্স পর্বের ছাত্রী ছিল, আমি খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে সেখানে কয়েকটি কোর্স পড়িয়েছিলাম, এবং নেহরীনকে ছাত্রী হিসেবে পেয়েছিলাম। আমি দেখেছি, নিম্নবর্গীয় মানুষ এবং অভিবাসীদের নিয়ে তার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। নেহরীন আজ নেই; তার পরিচিত সবাই তাঁর অনুপস্থিতির বেদনা অনুভব করেন। আজকের বক্তৃতার বিষয়টি নিশ্চয় তার অনুমোদন পেত।

ড. আকবর আলী খানও নিম্নবর্গীয়তার সংকট ও রূপায়ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস নিয়ে তাঁর উৎসাহ রয়েছে এবং ১৯৮০-র দশকে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এই নতুন ইতিহাসতত্ত্বক তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এই আলোচনার শুরুতে ইতিহাসবিদ ড. খানকে শ্রদ্ধা জানাই।

নিম্নবর্গীয়তা, ইতিহাস ও মার্ক্স

গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমি স্কুল পাশ করে কলেজে ভর্তি হই এবং ছাত্র রাজনীতিতে নাম লেখাই। এই রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙ্গালির স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এবং জনমানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। এই উদ্দেশ্যগুলিকে অবশ্য যতটা না বাস্তব, তার চাইতে বেশি বিমূর্ত বলেই মনে হত আমার কাছে। তবে কলেজে পড়ার সময়ই জনমুক্তির একটি ভিন্ন – যদিও অনেকের কাছে তা ছিল একমাত্র এবং নির্বিকল্প – আদর্শের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, যার নাম ছিল মার্ক্সবাদ বা মার্ক্সবাদী বীক্ষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়ে, এবং বিপুল সংখ্যক সহপাঠীকে আমি এই মতবাদে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে দেখি। ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন প্রগতি প্রকাশনী নামে একটি বইয়ের দোকান ছিল, যেখান থেকে নিতান্ত কম দামে মার্ক্সের অনেক বই আমি সংগ্রহ করি। সাহিত্যের পাশাপাশি মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর, এবং তাঁদের সূত্র ধরে জার্মান দার্শনিক ও আদর্শবাদী চিন্তক ফেড্রিশ হেগেল ও অন্যান্য লেখকের বই পড়াটা আমার জন্য একটা চর্চা হয়ে দাঁড়ায়। সময়টা ছিল সমস্ত বিশ্বের – এবং বাংলাদেশের – জন্য একটা স্বর্ণযুগের মতো। বামপন্থা তখন মানুষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, এবং নতুন ও বিপ্লবী চিন্তায় সমর্থন দিচ্ছে। দৃশ্যমাধ্যম তখনো একটা সম্ভাবনা হয়েই থেকেছে, ছাপা মাধ্যমকে হঠিয়ে দিয়ে মানুষের মনোজগৎ দখলে নেয়ার অবস্থানে তা ছিল না। এজন্য পড়াশোনাটা

একটা নিত্যকর্তব্যের মতো অনেকেই নিতেন। বই এবং নতুন চিন্তার দেয়া নেয়া হত। আমি দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করার আগেই আমার কিছু বন্ধু প্র্যাক্সিস নামের একটি আলোচনাচক্র তৈরি করে ফেলে, যাতে মার্ক্সবাদকে তত্ত্বের অঞ্চল থেকে তুলে এনে প্রয়োগের অঞ্চলে কিভাবে স্থাপন করা যায়, তা নিয়ে আলাপ আলোচনা হত। মার্ক্সবাদ আমরা কতটা বুঝতে পারতাম সে প্রশ্ন উঠতে পারে – এবং এর উত্তরে বলা যায়, গভীরভাবে না হলেও ভাসাভাসাও নিশ্চয় – জ্ঞানবুদ্ধিতে এর একটা জায়গা দেয়ার জন্য যতখানি অভিনিবেশের প্রয়োজন ছিল তা দিয়েই আমরা অগ্রসর হয়েছি – তবে ওই প্রশ্ন ছাপিয়ে আমাদের আশাবাদের আন্তরিকতাটা বড় হয়ে ওঠে।

মার্ক্সবাদ নিয়ে আমাদের উচ্চাশা ছিল, কারণ আমরা সবাই সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতাম। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও,' অথবা 'সর্বহারারা জাগছে' এরকম শ্লোগান আমাদের কাছে এক অনিবার্যতা নিয়েই বাঙ্ময় হতো। মার্ক্স তাঁর থিসিস অন ফিউরবাখ (১৮৫০)-এর একাদশ থিসিসে লিখেছিলেন, 'দার্শনিকরা পৃথিবীটাকে নানান ভাবে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু কথা হল, এটিকে বদলাতে হবে।' কিভাবে এই বদলানোর কাজটি সম্ভব? অবশ্যই বিপ্লবের মাধ্যমে। মার্ক্স-এর ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স (১৮৫০)-এর এক জায়গায় আছে, 'বিপ্লব হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি-- এর লকোমোটিভ।' আমরা গভীর অভিনিবেশ নিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস পড়তাম, এবং একদিন সর্বহারাদের সফল বিপ্লবে শ্রেণীহীণ সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে, তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতাম। মার্ক্স-ই তো আমাদের জানিয়েছিলেন, শ্রেণীর উপস্থিতি নির্ভর করে পুঁজি ও উৎপাদনের বিকাশের ওপর, কিন্তু পুঁজি ও উৎপাদনের সঙ্গে শ্রেণীর সংযুক্তি সৃষ্টি করে বৈষম্য এবং লুণ্ঠন। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম ইতিহাসের এক অনিবার্যতার নাম। শ্রেণীসংগ্রামের ফলে সর্বহারাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আধিপত্য থাকবে একটা সময় পর্যন্ত, যার অন্তে সকল শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে।

ষাটের দশকে তো বটেই সত্তর দশক জুড়েই, 'সর্বহারা' বর্ণনাতেই আমরা শোষিত, নিপীড়িত মানুষকে জানতাম, নিম্নবর্গীয় বা সাবঅল্টার্ণ কথাটি তখনও চালু হয়নি – যদিও ইটালির মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ এন্তনিও গ্রামসি-র সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ নিয়ে লেখালেখিতে আমরা এ শব্দটি দেখেছি। গ্রামসি থেকে সাবঅল্টার্ণ-এর বর্ণনাটি ধার নিয়ে ১৯৮০-র দশকে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসতত্ত্ববিদরা উত্তর উপনিবেশী চিন্তার আলোকে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি পাঠে জাতীয়বাদী ইতিহাসতত্ত্বের বিপরীতে গিয়ে ইতিহাসের একটি বিকল্প উপহার দিতে গিয়ে এটি চালু করেন। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসতত্ত্বের মূল প্রবক্তা রণজিৎ গুহের লেখায় নিম্নবর্গীয়তাকে দেখা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার আধিপত্যবাদ বর্ণনায় একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবে যা শ্রেণী, বয়স, লিঙ্গ বা জাতপাত নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই কিছু মানুষকে ক্ষমতার বলয় থেকে দূরে রাখে। তবে মোটাদাগে নিম্নবর্গীয় বলতে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে তারা শিক্ষাবঞ্চিত, দরিদ্র, কুসংস্কারপীড়িত এবং অধিকার হারা। তাত্ত্বিক আলোচনায় অবশ্য এদের একটি রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে ধরা হয়েছে, যারা ক্ষমতার একটি ধারণাগত অবস্থানকে বৈধতা দেয়। নারীবাদী আলোচনায় যেমন ধরা হয় (সিমোঁ দ্য বুভয়া যেমন তাঁর *দ্য সেকেন্ড সেক্স* গ্রন্থে দেখিয়েছেন) জেন্ডার একটি সামাজিক নির্মাণ, সেরকম নিম্নবর্গীয়তাকেও আশির দশকের অনেক ইতিহাসতত্ত্ববিদ ক্ষমতার একটি ভিন্নতর বা other নির্মাণ হিসেবে দেখেছেন।

তবে এই আলোচনায় এই বক্তৃতার শেষ দিকে যাওয়া যাবে। তার আগে মার্ক্স কথিত সর্বহারাদের প্রসঙ্গে আরেকবার যাওয়া যাক। ষাটের এবং সত্তরের দশকে সর্বহারাদের পক্ষে বিপ্লবের বাণী এবং আহ্বান নিয়ে অনেক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন সক্রিয় ছিল। তাদের অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

সর্বাহারাদের প্রতি শুধু সহানুভূতি নয়, এক ধরণের দায়বদ্ধতাও অসংখ্য তরুণের ভেতর তখন তৈরি হয়েছিল। তারা সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বয়ান বা ডিসকোর্সে তার প্রতিফলন দেখতে চাইত। সাহিত্যকেও সেই আলোকে তারা পড়তে শুরু করলে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখককে 'বুর্জোয়া' বা প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে কাঠগড়ায় তোলা হয়। বুর্জোয়া, লুম্পেন বুর্জো য়া – এরকম বর্ণনা প্রায়শ গালিগালাজের মতো ব্যবহার করা হত। পশ্চিম বঙ্গে নক্সালপন্থীরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে বর্জন করল, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনাও কোনো কোনো জায়গায় ঘটল। বাংলাদেশে মার্ক্সবাদের উগ্রপন্থাটি বিশ্ববিদ্যালয় বা শহরগুলিতে তেমন হয়নি; বরং কুষ্টিয়া-যশোহর সহ গ্রামবাংলার নানা জায়গায় হয়েছে। এখনও কোনো কোনো সর্বহারা দল-উপদলের সহিংস ঘটনার খবর আমরা পাই।

ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদের উগ্রপঠনটি কেন একটি চর্চা হয়ে দাঁড়ায়নি, তার কয়েকটি কারণ আমার চোখে ধরা পড়েছে। প্রথমত বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সেসময় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন ও পরে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এই আন্দোলনের কাঠামো ও চালিকাশক্তি নির্ধারণে সংস্কৃতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সংস্কৃতির আবার একটি দীর্ঘ, শক্তিশালী, এবং অংশগ্রহণমূলক ঐতিহ্যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যা ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং জীবনবাদী। এই সংস্কৃতির রূপ নির্মাণে যারাই অবদান রেখেছিলেন তাঁদের 'বামপন্থায় বিশ্বাসীরাও' আস্থায় রেখেছিলেন। তাছাড়া পাকিস্তানের কর্তৃত্বপরায়ন, ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতিচিন্তায় কয়েকজন বাঙ্গালি কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীকে বর্জন করা হলে তার প্রতিবাদে তাঁদেরকে সামনে এনে প্রতিরোধের আন্দোলন বেগবান করা হয়েছিল। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণাদায়ী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয় একটি কারণ ছিল ষাটের দশক থেকে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে একটি প্রতি-আখ্যান রচনার প্রথার। পাকিস্তানি রাজনীতি যেখানে কেন্দ্রের একচেটিয়া দাবীদার ছিল, এবং বাঙ্গালির রাজনীতিকে কেন্দ্রের অধীন করে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিতে চেয়েছিল, ছয় দফার আন্দোলন ও তার পরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে কেন্দ্রকে একটা শক্ত জবাব দিয়ে দেয়ার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। ছয় দফায় যতটা না, তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে বাঙ্গালি তার একটি নিজস্ব কেন্দ্র তৈরি করে তার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল, যা স্বাধীনতার পথ ধরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি ঘটেছিল। আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতি-আখ্যানকে আমরা মূল আখ্যানে পরিণত করে একটি নিজস্ব কেন্দ্র নির্মাণে নিয়োজিত করেছিলাম। প্রতি-আখ্যান তৈরির সময়টাকে আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে গুরুজন-উণজন বিভাজনে যাইনি, কারণ একে তো তা আমাদের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক চিন্তার সঙ্গে মানানসই নয়, তার ওপর 'বিভাজনে শক্তি ক্ষয়' চিন্তা থেকে তা অপ্রয়োজনীয়ও ছিল। বরং পঞ্চাশ দশক থেকে অবয়ব পাওয়া আমাদের শহুরে আধুনিকতার প্রবণতার বিপরীতে আমরা উণজনের সংস্কৃতিকে বরং প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলাম। এই প্রক্রিয়ায় গতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল দ্বৈততা শক্তি পাওয়ার কথা নয়।

তৃতীয় কারণটি ছিল আমাদের বামাদর্শে দীক্ষিত রাজনৈতিক দলগুলি বিরাজমান সামাজিক বাস্তবতার বিকল্প নির্মাণে বিপ্লবের যে আহ্বান জানাতো তাতে শ্রেণীশত্রুদের খতম করার কথা থাকলেও, এবং তাদের 'ভূস্বামী, মধ্যসত্বভোগী, লুম্পেন বুর্জোয়া' ইত্যাদি পরিচয়ে উপস্থাপনা করা হলেও, সে বিপ্লবকে

যতটা ভাঙ্গার, তার চাইতে গড়ার লক্ষে প্রচলিত করার প্রত্যয়টা বেশি থাকত। ফলে শ্রেণীসংগ্রামের নামে সহিংস বিপ্লব সংগঠনের উদ্যোগ শহর-কেন্দ্রিক বাম দলগুলোকে নিতে দেখা যায়নি। তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতিতে সংযোজন ও সংশ্লেষণের যে প্রবণতা – ইংরেজিতে যাকে syncreticsm বলে বর্ণনা করা যায় – দেখা দেয়, তার ফলে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হলেও তা যে ব্যাপক সহিংসতা পাবে, সেরকম সম্ভাবনা আমরা দেখিনি। তবে স্বাধীনতার পর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তার একটি ঘোষিত নীতি সমাজতন্ত্র হলেও তা সংবিধানেই সীমিত হয়ে থাকল। মার্ক্সবাদের আদর্শ থেকে ওই সরকার ছিল অনেক দূরে। পরবর্তী সরকারগুলোর কথা আর না-ই বলা হল। পেছন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলা যায়, একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক – বাস্তবতায় বামপন্থার আন্দোলন সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না, যদিও, তাত্ত্বিকভাবে, সময়টা অনুকূল থাকার কথা ছিল।

সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়তা

আমরা যখন ষাটের দশকের শেষে সাহিত্য পড়তাম, চলচ্চিত্র দেখতাম, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের খোঁজ খবর রাখতাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্য এই ছিল না যে শিল্পের ও সৃষ্টিশীলতার এসব শাখায় মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রতিফলন বের করতে হবে। প্রতিফলনের দেখা মিললে আমরা খুশি হতাম, অনুপ্রাণিত হতাম; দেখা না মিললেও সেসব বর্জন করতাম না। বরং নিজেদের মতো করে এর কারণগুলি নির্ণয় করতাম, সমালোচনা বা Critique তৈরি করতাম। শুধু সাহিত্যের পাঠক নন, যারা লিখতেন, বিশেষ করে তরুণ এবং প্রতিবাদী কবি-কথাসাহিত্যিকরা, তারাও তাদের লেখায় সর্বহারাদের উপস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। তাদের প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিন; বড় কাগজগুলির সাহিত্য পাতায় জায়গা পাওয়াটা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল না। তবে ছয়-দফা পরবর্তী উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে প্রতিবাদী লেখকদের সক্রিয়তাটি বাঙ্গালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি এবং স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষেই বেশি ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে উগ্র মাওবাদী দলগুলো ছাড়া বামধারার অনেক দলের অনেক অনুসারী এমন বিশ্বাস লালন করতেন যে এই আন্দোলনে একটি পরিসমাপ্তি হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যা শ্রেণীসংগ্রামের এবং সর্বহারাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেবে।

বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের জন্য অবিভক্ত বাংলা থেকে শুরু করে ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সর্বহারা ও প্রান্তিক লোকজনের রূপায়ন ও উপস্থাপনার একটি পূর্বাপর চিত্র তৈরি করাটা অনেকটা সহজ হলেও ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সাহিত্যের পাঠকদের জন্য, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি বেশ কঠিন একটি কাজ ছিল। বাংলা সাহিত্যে গ্রাম ও গ্রামের কৃষক ভূমিহীন-মজুরের উপস্থাপনা একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের উপেনের বা বাইচরণের মতো চরিত্রদের, অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়হরি, খেমতি অথবা মুসাম্মত কুন্তি এবং তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের দীনু বা তারিণী মাঝির মধ্যে সর্বহারার চরিত্র পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে। দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণ এবং নিপীড়নের চিত্রগুলোও কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটকে অসংখ্য। এটি কোলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আমরা যেসব কবিতা উপন্যাস অথবা নাটক পড়তাম, তাতে কয়েকজন লেখকের লেখা ছাড়া প্রান্তিক লোকজনের উপস্থিতি তেমন প্রবল ছিল না। অনেক গল্প উপন্যাস গ্রামের পটভূমিতে রচিত হলেও সেগুলোতে যে সমাজ ও জীবন প্রতিফলিত হত, এবং ধনী-দরিদ্র, মুখ্য-গৌণ ও প্রধান-অপ্রধান রেখায় সামাজিক বিভাজনের অবস্থাটি চিত্রিত হত, তাতে সর্বহারার অবস্থা বা সর্বহারাত্ব এবং নিঃস্বতা ও

প্রান্তিকতার রূপটি, কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তেমন প্রকটভাবে ধরা পড়ত না। তেমন ব্যতিক্রমের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম ব্লেইক, চার্লস ডিকেন্স, বেঞ্জামিন ডিজরায়েলি এবং যারা সামাজিক উপন্যাস লিখতেন, তাদের কেউ কেউ, যেমন শার্লট ব্রন্টে (বিশেষ করে তার শার্লি উপন্যাসটি, যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে), এলিজাবেথ গ্যাস্কেল, (তাঁর ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত *মেরি বার্টন উপন্যাসটি*) অথবা ডিএইচ লরেন্স। উনিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপ ও ইংলন্ডে ছিল শিল্প বিপ্লবের (অথবা, কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে শিল্প-বিপ্লবোত্তর কাল। ফলে কলকারখানার শ্রমিক ও নগরের নিম্নবর্গীয়রাই এই কবি-ঔপন্যাসিদের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ গ্রাম কেন্দ্রিক দারিদ্রের কিছু ছবি এঁকেছেন (যেমন, তার 'মাইকেল' ও 'লীচ গ্যাদারার' কবিতায়। তাঁর মতো আরো কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের পঠিত সাহিত্যে গ্রামের কৃষক ও ভূমিহীনের চাইতে কলকারকাখানার শ্রমিকদের উপস্থাপনা অনেক শক্তিশালীভাবে এসেছে। আমরা জানতাম, ১৮৪০ এর দশককে 'ক্ষুধিত দশক' হিসেবেই চিহ্নিত করা হত, যদিও শিল্পায়ন ও পুঁজির বিনিয়োগ থেকে মুনাফা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৮৫০ এর দশক থেকেই ইংলন্ডে সমৃদ্ধির কাল শুরু হয়। এই সমৃদ্ধির পেছনে একটি বড় শক্তি ছিল উপনিবেশ থেকে লুণ্ঠিত ও সংগৃহীত সম্পদ। ১৮৫১ সালে হেনরি কোল এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে লন্ডনের কৃস্টাল প্যালেসে পশ্চিমা দেশগুলির শিল্পের কাজের যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, যাকে 'দি গ্রেট এক্সিবিশন' বলে ভূষিত করা হয়, তাতে শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও ডিজাইন – এসব ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলির অগ্রগতিকে তুলে ধরা হয়। ইংলন্ডের সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি, নগরায়ন এবং যোগাযোগের ব্যাপক অগ্রগতি এক গতিশীল সমাজ নির্মাণে ভূমিকা রাখলেও উনিশ শতক (যার একটি বড় অংশ ভিক্টোরিয়ান যুগ বলেও অভিহিত) জুড়ে সামাজিক রক্ষণশীলতা, বিজ্ঞান ও প্রগতি নিয়ে সংশয়বাদ ও পুঁজির শাসন নিম্নবর্গীয়দের অবস্থানটিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেনি। এবং নিম্নবর্গীয়দের পক্ষে কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনও সক্রিয় ছিল না। সাহিত্যেও তাদের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান নিতে তেমন কাউকে দেখা যায়নি। কুড়ির দশকেও এই চিত্রের কোনো ইতর বিশেষ হয়নি। বরং আধুনিকবাদের সূচনা হলে দৃষ্টিভঙ্গীগত যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে সমাজ পরিবর্তনের পরিবর্তে মানুষের মনোস্তত্ত্ব পাঠ, নাগরিক সভ্যতার বিকার বিক্ষোভ-ক্লান্তির খতিয়ান নেয়া এবং এসব প্রতিফলিত করতে গিয়ে ফর্ম বা আঙ্গিক ও শৈলীগত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ বেশি গুরুত্ব পায়।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ইংরেজি বিভাগে তখন সংস্কৃতি পাঠ অথবা মিডিয়া স্টাডিজের অনুপ্রবেশ বা অংশগ্রহণ ঘটেনি, নিউ ক্রিটিসিজমের ও ফর্মালিজমের বাইরে কোনো সাহিত্যতত্ত্ব, এমনকি মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্বও জায়গা করে নিতে পারেনি। পাঠক্রম প্রণেতাদের সামনে যেসব উদাহরণ বা মডেল ছিল, সেগুলি ছিল মূলধারার গ্রন্থ / সাহিত্য বা literary canon ভিত্তিক। এই ক্যানন বলতে কোনো বিশেষ সময়কালে যে সব সাহিত্যগ্রন্থ সবচেয়ে প্রভাব রেখেছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়। ফলে আমাদের সাহিত্য পাঠ ছিল এফ আর লিভিসের 'দি গ্রেট ট্রাডিশন'-এর অনুবর্তী। লিভিস ছিলেন একজন প্রভাবশালী সাহিত্য সমালোচক ও তাত্ত্বিক, এবং ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ওই শিরোনামের বইটিতে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্যটি সনাক্ত করেছিলেন কয়েকজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে, যাদের একজনই, জেন অস্টেন ছিলেন নারী। বাকিরা ছিলেন পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ-প্রোটেস্ট্যান্ট। এই ঔপন্যাসিকদের ভেতর নীতির প্রশ্নে লিভিস একটি অভিন্ন অবস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ছিল তাদের গাম্ভীর্য বা সিরিয়াসনেস এবং নৈতিক জটিলতার প্রশ্নে দায়িত্বশীল আচরণ। আমাদের পাঠক্রমে অ-ইউরোপীয় কোনো লেখক – এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার যারা ইংরেজিতে

লিখতেন – স্থান পাননি। প্রতিনিধিত্বমূলক বৈচিত্র, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং আন্তগ্রন্থিকতার যে সূত্রগুলো এখন ইংরেজি বিভাগুলোর পাঠক্রমকে অনেক পরিব্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী করেছে, তখন তার অভাব ছিল।

বিভাগীয় পাঠক্রম অনুযায়ী সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে এজন্য আমরা কয়েকটি প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। এগুলো হল: সাহিত্যে কি শুধু একটি শ্রেণীরই – উচ্চবর্গীয়দের – প্রভাব এবং উপস্থাপনাগত ক্রমিকতা থাকবে, নাকি নিম্নবর্গীয়ের (ওই সময়ের ভাষায় প্রান্তিক / সর্বহারাদের) একটি বিশুদ্ধ রূপায়নও থাকবে? সাহিত্য কি ইউরোকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার ধারক, নাকি তাতে বৈশ্বিক বাস্তবের একটা প্রতিফলন থাকবে? সাহিত্য কি শুধুই কোনো মহৎ ঐতিহ্য-নির্ভরতার রূপায়ন, নাকি তাতে বহুত্ববাদের, ভিন্ন – এমন কি বিপরীত-ঐতিহ্যেরও – একটি জায়গা তাতে থাকবে? সাহিত্য কি পুরুষকেন্দ্রিক, শুধু পুরুষলিখিত, অথবা নারীরা লিখলেও তাতে পুরুষের অবস্থানটিই শিরোধার্য? নারীর অংশগ্রহণ কি শুধু চিত্রিত চরিত্রের মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে? যে কজন নারী লেখকের কবিতা, কথাসাহিত্য আমরা পড়তাম, যেমন – জেন অস্টেন, শার্লট ও এমিলি ব্রন্টে, জর্জ এলিয়ট (যার প্রকৃত নাম ছিল মেরি এ্যান ইভান্স এবং যিনি সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে পুরুষনামের আড়াল নিয়েছিলেন) এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং কুড়ি শতকের ভার্জিনিয়া উলফ অথবা ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড – তাদের সকলের লেখায় নারীর নিজের কথাগুলি সবসময় উঠে আসত না। তাছাড়া তাদের দৃষ্টি ছিল উচ্চ অথবা মধ্যবিত্তের জীবনে। লেখার গুণে তাদের বইগুলি আমাদের আকর্ষণ করত, কিন্তু আমাদের জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সেগুলোর তেমন কোনো মিল আমরা পেতাম না। ফলে এদের আবেদন ছিল শিল্প ও নান্দনিকতা, সৃজনশীলতা ও রূপান্তরী কল্পনা – অর্থাৎ ভালো সাহিত্যের মাপকাঠিতে যা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সৃষ্টি করে – প্রধানত সেই অঞ্চলে।

আমরা যারা মার্ক্সবাদী চিন্তা ও বীক্ষণে আস্থা স্থাপন করেছিলাম, এবং মার্ক্সবাদী আদর্শবাদটা তখনও সতেজ ছিল, তাদের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের এই ক্যানন ভিত্তিক নির্বাচনের বাইরে দৃষ্টি ফেলাটা জরুরি ছিল। আমরা তৃতীয় বর্ষ শেষ করার আগেই বার্টল্ট ব্রেশট-কে আবিষ্কার করেছি, ম্যাক্সিম গোর্কিকে আবিষ্কার করেছি, পাশাপাশি মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস-এর দি লং রেভ্যুলেশন (১৯৬১) ও মনোবিজ্ঞানী-মার্ক্সবাদী চিন্তক ফ্রানজ ফ্যানোনের দি রেচেড অফ দি আর্থ (১৯৬১) জোগাড় করে ফেলেছি। ঢাকার দু'তিনটি বইয়ের দোকানে তখন পশ্চিমা সাহিত্যের বই পাওয়া যেত, যদিও সেগুলোর দাম আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। ফলে একটি বই একজন কিনলে পাঁচজন মিলে তা পড়তাম। এই বইগুলো আমাদের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাকে জীবন ও বাস্তবতামুখী হতে সাহায্য করল। যেটুকু চিন্তা ভাবনা ও কৌতূহলের সূত্রপাত বইগুলো করেছিল, তা দিয়ে আমরা পাঠক্রমের বইগুলো পড়তাম, এবং বিপন্ন, প্রান্তিক, ক্ষমতা ও বিত্তবৃত্তের বাইরের মানুষজনকে কিভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তার একটা আনুপর্বিক হিসাব নেয়ার চেষ্টা করতাম।

শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তৃতীয় বর্ষেই শেক্সপীয়ারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তবে তা আরো দৃঢ় হয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে। শেক্সপীয়ার অবিসম্বাদিতভাবেই যে কোনো ক্যানন-ভিত্তিক সাহিত্য চিন্তায় গুরুস্থানীয়। তাঁর নাটকগুলি পড়ার সময় আমাদের কয়েকটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে বলা হত, যেমন রেনেসাঁস দর্শন ও আদর্শ চিন্তা ও শেক্সপীয়ার; শেক্সপীয়ার ও মানববাদ এবং তাঁর নাটকে মানবের

রূপায়ণ; তাঁর সময়কার (অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এলিজ্যাবেথীয় ও জ্যাকোবীয় যুগের) সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি, তাঁর নাটকে দ্বন্দ্ব ও নানাবিধ দ্বান্দ্বিকতা যার প্রকাশ ঘটে অর্ডার বা শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা, শুভ-অশুভর চিরন্তনতা-সময় নির্দিষ্টতা ইত্যাদির দ্বন্দ্বে; ক্ষমতা, বিচার এবং শ্রেণী; প্রেম ও প্রকৃতি এবং সমাজে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের ভূমিকা। পাশাপাশি শেক্সপীয়ারের নাটকে নারীর অবস্থান এবং পুরোহিততন্ত্রের রূপায়ণ। সব বিষয়ে যে আমাদের পক্ষে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হত, তা নয়, তবে যতটুকু সম্ভব শেক্সপীয়ারকে এসব বিষয় ও চিন্তার প্রেক্ষাপটে আমরা বোঝার চেষ্টা করতাম। আমাদের মার্ক্সপাঠ কয়েকটি বিষয়ে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করেছিল – যেমন মানব ও মানববাদ, শ্রেণী ও ক্ষমতা এবং শেক্সপীয়ারের নারী চরিত্র।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবচিন্তায় যে-মানবকে একটি আদর্শিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাকে 'সম্পূর্ণ মানুষ' হিসেবে যতই চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল ও সমগ্রের প্রতিনিধিত্বকারী বলা হোক, নিবিড় তদন্তে তার পশ্চিম-কেন্দ্রিক এবং কর্তৃত্ববাদী পরিচয়টি ধরা পড়ে। ওই মানব শ্বেতাঙ্গ, শিক্ষিত ও অধিকারপ্রাপ্ত, খৃষ্টধর্ম অনুসারি এবং এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী। ফলে এই মানবচিন্তায় নারী বা ভিন্ন সংস্কৃতি, বর্ণ বা ধর্মের মানুষের স্থান নেই। শেক্সপীয়ার যদিও তার মানবচিন্তাকে উদারভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক করার চেষ্টা করেছেন, শেষ বিচারে সেই মানব নিয়ে হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত স্বগতকথনে হ্যামলেটের শ্রেণীচরিত্রের প্রতিফলনই ঘটে।

> কী চমৎকার এক সৃষ্টি মানুষ, যুক্তিতে কী মহান, বুদ্ধিবৃত্তিতে কী অসীম, কায়া আর সপ্রাণতাতেও, কাজে কী একনিষ্ঠ আর প্রশংসনীয়, অনুভবে কী দেবতাতুল্য . . . (২.২)

এই স্বগতকথনটি কোনো ঊণচরিত্রের যেমন দি টেম্পেস্ট নাটকের ক্যালিবানের কণ্ঠে স্থান পাবে না, কারণ এর ভাষা, ভাষা ও ভাবের ওপর বক্তার অধিকার, এর চিন্তা ও দর্শনের জগতে তার প্রবেশাধিকার কোনো ঊণচরিত্রের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না। হ্যামলেট পড়ার সময় মানব নিয়ে আমাদের এই দ্বিধাটি দেখা দিয়েছিল, যেহেতু মার্ক্স থেকে আমরা যে পাঠটি পেয়েছিলাম, তাতে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজ বা কৌম সমাজকে আমরা গুরুত্ব দিতাম। মার্ক্স তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে, ব্যক্তি মানুষ থেকে সামাজিক মানুষের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন এবং মানবকে অপরিবর্তনশীল, নশ্বর অথবা অতিমার্গীয় বা transcendental অবস্থানে দেখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানব চরিত্র পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তন তার কোনো অতিমানবীয় গুণ থেকে সম্পন্ন হয় না, হয় তার ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। লুই আলতুজার মার্ক্স-এর মানবতাবাদের ভেতর যে এক ধরণের প্রতি-মানবিকতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং নিজের প্রতি-মানবিকতা চিন্তায় মানবের ও মানবিকতার এক নতুন পাঠ উপহার দিয়েছিলেন এ বিষয়টিও শেক্সপীয়ারের মানবকে পড়তে আমাদের সাহায্য করেছিল। আলতুজারের প্রতি মানবিকতায় মানবের (এবং মানবীর) বিশ্বাস, পছন্দ, বিচারবোধ, আশা-বাসনা সমাজের তৈরি; মানবও তাই সমাজের এক নির্মাণ ও বিনিয়োগ। মার্ক্সের গতিশীল সমাজচিত্র ভূগোল ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে গড়ে উঠেছে, ফলে এতে কোনো বিশেষ স্থানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। আলতুজারের প্রতিমানবিকতা রেনেসাঁস থেকে চলে আসা মানব ও মানবিকতার আদর্শচিন্তাকে অনড়, অসম্পূর্ণ, ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং অধিবিদ্যানির্ভর বলে চিহ্নিত করে একে প্রত্যাখ্যান করে।

মার্ক্সবাদ অবশ্যই শ্রেণী ও শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বসমূহকে চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করে। শেক্সপীয়ার শুধু শ্রেণী নয়, বর্ণ, ধর্ম, ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টন – এবং ইউরোপীয়

উপনিবেশবাদ একটি প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার অনেক আগেই এর নানা অভিঘাত – নিয়ে লিখেছেন। ইতিহাস যে ক্ষমতাকে নির্ভর করে রচিত হয়, অর্থাৎ ইতিহাস যে ক্ষমতার বয়ান, সে বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাছাড়া শেক্সপীয়ারের নারী চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হত। কিছু নারী চরিত্র তো খুবই শক্তিশালী এবং তারা বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি দিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজে তাদের অবস্থানটি সংহত করে নিয়েছিল। তবে তাদেরকে নারীবাদী কোনো অবস্থান থেকে পড়ার সুযোগ আমাদের ছিল না। নারীবাদ নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ আমাদের শিক্ষকদের ভেতরও দেখতে পাইনি, যতটা তাদের শ্রেণীগত অবস্থানটি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার উৎসাহ দেখতে পেয়েছি। শেক্সপীয়ারের নারীদের নিয়ে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং বই লিখেছেন। সেগুলোতে এর চমৎকার প্রকাশ রয়েছে।

তাছাড়া নারীবাদী সাহিত্য ও নারীদের রচিত সাহিত্য নিয়ে একটা দ্বন্দ্বও তখন ছিল, যদিও ইংরেজি পাঠক্রমে তত্ত্ব বা থিওরির প্রবেশের পর সেটি কেটে যায়। আমাদের সামনে তখন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন, যার ইংরেজিতে লেখা সুলতানা'স ড্রিম গ্রন্থটিতে নারীদের যে শক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তার সাথে শেক্সপীয়ারের পোর্শিয়া (মার্চেন্ট অফ ভেনিস) অথবা, একটু ভিন্নভাবে হলেও, মাচ এডো এবাউট নাথিং-এর বিয়েট্রিস-এর মিল পাওয়া যায়। পোর্শিয়াও বুদ্ধি দিয়ে – শারিরীক বা অস্ত্রশক্তি দিয়ে নয় – একটি প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছিল। বিয়েট্রিস স্পষ্টবাদী, যুক্তিনির্ভর। সেও নিজের অস্তিত্বকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সুরক্ষা দিয়েছে।

তবে মার্ক্সবাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ যে বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে এবং অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে তা হচ্ছে শেক্সপীয়ারের নাটকে প্রান্তিক চরিত্রের অবস্থান। এই অবস্থানকে এখন আমরা নিম্নবর্গীয় বলে চিহ্নিত করতে পারি, যেহেতু নিম্নবর্গীয়তার প্রচলিত সংজ্ঞায়, যে সংজ্ঞাটি নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা আশির দশক থেকে একটি সচল মুদ্রায় পরিণতি করেছেন, শেক্সপীয়ারে তারা ওই বর্গেই পড়ে। আমরা বিবেচনায়, প্রধানত তিন ধরণের নিম্নবর্গীয় চরিত্র আছে – এক শ্রেণীর চরিত্র যাদের ক্ষমতার বয়ানে উপজন বলা যায়, যদিও ক্ষমতা ও শ্রেণীকে বৈধতা ও শক্তি দিতে এদের প্রয়োজন ছিল: যেমন সৈনিক, ভৃত্য এবং রাজ বা ক্ষমতাদরবারে কর্মরত গৌণ চরিত্ররা। এরকম অনেক চরিত্র শেক্সপীয়ারের নাটকে আছে যাদের ভূমিকা অলঙ্কারিক, এবং কোনো ঘটনায় তাদের প্রভাব খাটানোর কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। এরা বেশির ভাগই নামহীন, তাদের উপস্থিতিও ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর চরিত্র আছে যারা গৌণ বা উণ হলেও নাটকে এদের অভিঘাত প্রচুর। এরা অনেক সময় প্রধান কোনো চরিত্রের বিকল্প সত্তা, বড় ঘটনা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এরা বুদ্ধিমত্তা ও সুবিবেচনা দিয়ে তাদের অবদান রাখে, এবং এদের অংশগ্রহণ না হলে কোনো ঘটনা অসমাপ্ত থাকতো বা যৌক্তিক একটি পরিণতি লাভ করত না। দু'এক চরিত্র আছে, যাদের বয়ানে নাটকের মূল চিন্তা বা দ্বন্দ্বগুলিই প্রকাশিত হয়। আর তৃতীয় এক শ্রেণীর চরিত্র আছে, যারা গৌণ হলেও নাটকে তাদের ভূমিকা প্রধান চরিত্রের ধারে কাছে পৌঁছে যায়, এবং যাদের মাধ্যমে শেক্সপীয়ার নানাবিধ দ্বন্দ্বের এক সুন্দর উপস্থাপনা করেন।

প্রথম যে শ্রেণীটির কথা বলা হল, তাদের যেহেতু বিবচেনায় আনার প্রয়োজন নেই, দ্বিতীয় শ্রেণীটির দিকে তাহলে দৃষ্টি ফেরানো যায়। এই শ্রেণীর চরিত্রে একদিকে যেমন কিং লিয়ার নাটকের ফুল বা ভাঁড় এর মতো একেবারে নামহীন গোত্রহীন চরিত্র আছে; অন্যদিকে বনেদী ক্যাপুলেট পরিবারের (রোমিও এন্ড জুলিয়েট) কন্যা জুলিয়েটের নার্স চরিত্রটিও আছে, যদিও তারও কোনো নাম নেই। অন্যদিকে এ মিডসামার নাইটস ড্রিম নাটকটিতে একদিকে শহুরে বনেদী এবং ক্ষমতাবান পরিবারের কিছু সদস্য এবং

অন্যদিকে অভিজাতকৃতিক কিছু চরিত্রের বিপরীতে নিম্নপেশার কিছু চরিত্রকে দাঁড় করানো হয়েছে, যাদের কেউ দর্জি, কেউ তাঁতি (মোটা দাগে শেক্সপীয়ার এদের 'র‍্যুড মেকানিকালস' বলে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ এরা শিক্ষাদীক্ষাহীন কামলা মিস্ত্রি), এদের নামগুলোও হাসিঠাট্টার বিষয় হয়েছে, অথচ এরা না থাকলে নাটকটাই দাঁড়াতো না। এরকম আরো এক চরিত্র ওথেলো নাটকের এক দ্বাররক্ষী বা পোর্টার, অন্য আরেকটি দ্বিতীয় রিচার্ড নাটকের মালী। এ দু'জনেরও নাম নেই, তবে তাদের এমন এক ভূমিকায় শেক্সপীয়ার নামিয়েছেন, যাতে তারা নাটকের মূল গল্পকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে, এর নৈতিক দ্বন্দ্বটি ব্যাখ্যা করে। মেজার ফর মেজার নাটকে শেক্সপীয়র ক্ষমতা ও ক্ষমতা সমর্থিত বিচার ব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন; যারা অপরাধী, যারা আইন ভাঙ্গে, তাদের পরিবর্তে আইনপ্রণেতাদের, নারীর পরিবর্তে পুরুষের ওপর নীতি-নৈতিকতাকে অবহেলা করার দায় চাপান। মিস্ট্রেস ওভারডান নামে একটি চরিত্র আছে এই নাটকে, যে একটি পতিতালয় চালায়। শেক্সপীয়ার তার নাম নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, যেমন করেছেন হেনরি দি ফিফথ্, পার্ট ওয়ান-এর মিস্ট্রেস কুইকলিকে নিয়ে, যে ওভারডানের মতো একই পেশার মানুষ। অথচ যৌনতা এবং পতিতাসুলভ নামের আড়ালে, শেক্সপীয়ার এই পেশায় কেন নারীরা আসে, তার একটি সামাজিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। মিস্ট্রেস ওভারডান যখন জানতে পারে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক এ্যাঞ্জেলোর প্রচলিত আইনে অবৈধ যৌনসম্পর্ক স্থাপনকারিরা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবে, সে নিজের বিষয়ে এরকম একটি বর্ণনা হাজির করে:

যুদ্ধ আর ঘামের কারণে
জেল জুলুম আর দারিদ্রের কারণে
আমি সর্বংসহা হয়ে গেছি (১. ২)

মেজার ফর মেজার নাটকে শেক্সপীয়ার যে আয়রনিটা প্রধান করেছেন, তা হচ্ছে ক্ষমতাবানদের, বা বড় অর্থে ক্ষমতার, দ্বিত্বতা। এ্যাঞ্জেলো যে আইনের বলে মিস্ট্রেস ওভারডানের মতো নারীদের ওপর খড়্গ নামাতে পারে, সেই আইনটি সে নিজেই ভাঙ্গে। তার চরিত্রেও রয়েছে কলুষ, এবং বিষয়টি শেক্সপীয়ার খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেন। অথচ রাজ্যের প্রকৃত শাসক যখন ছদ্মবেশে দেশ ঘুরে দেখা শেষ করে ফিরে আসেন, এবং পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তিনি এ্যাঞ্জেলোকে শাস্তি দেয়ার, নিদেনপক্ষে তিরস্কার করার, পরিবর্তে পুরস্কৃতই করেন। ক্ষমতার এই একপেশে প্রয়োগ, বিচার ও আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা, এমনকি নৈতিকতার সংজ্ঞাও ইচ্ছেমতো পাল্টে দেয়া – এই বিষয়গুলি শুধু এই নাটকেই নয়, বরং অন্যান্য অনেক নাটকে শেক্সপীয়ার নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন।

যারা তাঁর সবগুলি নাটক পড়েছেন – ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডার্ক কমেডি, রোমান, ইতিহাসভিত্তিক নাটক – তারা শেক্সপীয়ারের কতগুলো বিশ্বাস, পর্যবেক্ষণ এবং ঘুরে ফিরে আসা মোটিফকে সহজেই শনাক্ত করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও বিচার; রাজনীতি, ইতিহাসের অভ্রান্ত পাঠ এবং ইতিহাসের ভ্রান্তি; ধর্ম ও ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণচিন্তা; মানবচরিত্রের রহস্য, জটিলতা-সরলতা এবং মানবসম্পর্কের নানান দিক, উচ্চাশা এবং দুরাশার নানা আত্মধ্বংসী সমীকরণ; নারী, বর্ণ, গোত্র এবং প্রান্তিক মানুষের অবস্থান, ইত্যাদি। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মূল কাহিনীর বিন্যাসে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের মধ্য দিয়ে, চরিত্রদের কথাবার্তা এবং স্বগতবচনে, নাটকের প্রতিপাদ্যে ও দর্শনচিন্তা বা মূল অভিজ্ঞানে এসব প্রকাশিত। তবে মূল কাহিনী থেকে সরে গিয়ে অনেক উপকাহিনী বা সাবপ্লটেও শেক্সপীয়র এসবের প্রকাশ ঘটান। অনেক সময় উপকাহিনীগুলো মূল কাহিনীর সমান্তরাল বা তার থেকেও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কিং লিয়ার নাটকে। নাটকের দর্শক বা পাঠকরা এই বৈশিষ্টটিও সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

কিন্তু শেক্সপীয়ারের নাটকে কিছু কিছু অনুধাবন বা ভাবনা আছে যা খুব সহজে চোখে পড়ার মতো নয়, এবং প্রথাগত পাঠে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এবং এসব চিন্তাভাবনার একটা হিসাব নেয়া গেলে শেক্সপীয়ারের সমর্থন ও সমবেদনা কোন বা কাদের দিকে আছে, তা বোঝা সম্ভব। এসব চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে, সমাজে নারীর অবস্থান, প্রান্তিকতা ও নিম্নবর্গীয়তার অনিবার্য কিন্তু শেষ বিচারে প্রশ্নবিদ্ধ উপস্থিতি, সুশাসনের শর্ত – এবং এক্ষেত্রে রাজা/রাণীর ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের বিপরীতে সুশাসনের অনস্বীকার্যতা, এলিট শ্রেণীর পূণর্মূল্যায়ন এবং কর্মফল। শেক্সপীয়ারের সব নাটক আমার পড়া হয়নি – এখনো ৩/৪ টি নাটক পড়ার বাকি – কিন্তু তাঁর বিখ্যাত অথবা কমখ্যাতি পাওয়া সকল নাটকেই তিনি যে তাঁর রেনেসাঁস-আদর্শচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন, তা খুব সহজেই আমি অনুধাবন করেছি। এই আদর্শচিন্তাগুলির মধ্যে ছিল আত্মদর্শন, মানব ও সমাজনীরিক্ষা, পরিসরের স্থানিক এবং বৈশ্বিক ব্যাপ্তি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্যেকুলার নির্মাণ, ক্ষমতার সঙ্গে জ্ঞানের সমীকরণটি মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা, মানব ও বিশ্বের পরিব্যাপ্ত ধারণাগুলির যথাযথ প্রতিফলন এবং জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বকে মেলানো।

এই আদর্শচিন্তাগুলিকে যখন শেক্সপীয়ার খুব ঘনিষ্টভাবে উপলব্ধি করছিলেন, বাজিয়ে দেখছিলেন, সেগুলোর দার্শনিক-বাস্তব ভিত্তিক প্রকাশের সকল সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখছিলেন এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন, একটি চিন্তার কয়েকটি বিকল্প জেনে রাখছিলেন, তিনি মানবের অবস্থানটি শুধু কেন্দ্রের নয়, প্রান্তের চোখ দিয়েও দেখেছেন। এজন্য তাঁর নাটকে মানবের একটি রূপ এলিটধর্মী – শ্রেণী, ক্ষমতা ও বিত্তের বিচারে যা নির্দিষ্ট, এবং অন্য একটি রূপ প্রান্তিকতার। নাটকের মূল শক্তি এবং বহমানতা যদি এলিট চরিত্ররা যোগান দিয়ে বা নিশ্চিত করে থাকে, তাহলে এর ভেতরের নানা উত্থানপতন, এর সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বা critique নির্মাণ করা, এর নানা বৈপরীত্য ও ফাঁক-ফোঁকড় দেখিয়ে দেয়ার কাজটি করে প্রান্তজনেরা, তাদের উপবয়ান ও তাদের অবস্থান অনুয়ায়ী তৈরি অনুঘটনার মধ্য দিয়ে – যাতে নির্মাণ উপকরণের যোগান দেয় হাস্যকৌতুক, শ্লেষ অথবা খিস্তিখেউড়, এমনকি এলিটের জন্য কর্ণপীড়াদায়ক চৌরাস্তার ভাষা।

আমার আলোচনায় কিং লিয়ার-এর প্রসঙ্গ এসেছে। এর দুটি চরিত্র নাটকের তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক চিন্তাকে দার্ঢ্য দিতে সাহায্য করেছে: ফুল বা ভাঁড় – এ ভাঁড় আমাদের গোপালভাঁড়ের স্বধীনতা উপভোগ করে – এবং পাগল টম (যে আসলে ছদ্মবেশী এডগার)। পুরো নাটকে ফুল-এর ভূমিকা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সমতুল্য, অভিঘাতের দিক দিয়ে অনেক প্রধান চরিত্রকেও তা ছাপিয়ে যায়। তবে-ফুল এর চরিত্রে যাওয়ার আগে টম-এর চরিত্রের দিকে নজর দেয়া যায়: গ্লোস্টারের আর্ল বা গ্লোস্টারের বড় ছেলে এডগার তার ছোটভাই এডমন্ডের (গ্লোস্টারের বিবাহ বহির্ভূত সন্তান, এবং অশুভের প্রতীক) হাত থেকে বাঁচার জন্য এক পাগলের সাজে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, এবং এডমন্ডের হাতে অন্ধ হওয়া বাবাকে তার শেষ ক'দিনের সঙ্গী হিসেবে পথ দেখিয়ে চলে। শেক্সপীয়ার একে একজন নিম্নবর্গীয় হিসেবেই দেখেছেন। ছদ্মবেশী এডগারকে শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকের নৈতিক কণ্ঠ হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন তাকে জীবন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার জোগান দিচ্ছে তার নিম্নবর্গীয় সত্তা টম। অর্থাৎ টম-এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয়তার প্রয়োজনীয়তা এবং এলিটের বিপরীতে তার নৈতিক অনিবার্যতাকে তিনি তুলে ধরেছেন। যদিও শেক্সপীয়ার জানেন, জীবনে মানুষ নিম্নবর্গীয়তাকে গুরুত্ব দেয় না, তারা যে প্রান্তের সেই প্রান্তেই থেকে যায়। কিন্তু এদের ওপর শক্তিশালী আলো ফেলে জীবনে না হোক মঞ্চে শেক্সপীয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ উপহার দেন।

টম-এর তুলনায় ফুল একেবারেই প্রান্তিক, বলা যায় প্রান্তিকতার সে এক রহস্য। নাটকে তার কোনো নাম নেই, ভাঁড় হিসেবে তার একটা শ্রেণী অবস্থান আছে বটে, কিন্তু তাকে অনেক সময় রক্তমাংসের চরিত্র বলে ধারণা করাটাও কঠিন। আমরা অনুমান করি সে লিয়ারের দরবারে আড়ালে থাকা একজন মানুষ। লিয়ার স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলে সেও তার সঙ্গে যায়। কিন্তু ভাঁড়ের অবস্থান থেকেও উচ্চতর একটি তলে তাকে শেক্সপীয়ার বসিয়েছেন। নাটকের মূল চিন্তা, লিয়ার (ও অন্যান্য চরিত্রের) ও ঘটনা প্রবাহের ওপর সে যতক্ষণ মঞ্চে থাকে ততক্ষণ ক্রমাগত মন্তব্য ব্যাখ্যা-পাঠ-প্রতিপাঠ উপহার দিতে থাকে। তার কথাগুলো চাঁছাছোলা, সেসবে কোনো অস্পষ্টতা নেই। রাজা লিয়ারের মুখের ওপর সে যা তা বলে দিতে পারে, রাজাকে ভ্যাঙ্গাতে পারে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে। ভাঁড়রা সাধারণত এরকম স্বাধীনতা পায়, কিন্তু ফুল যেন একটু বেশিই পায়। একসময় পরিষ্কার বুঝা যায়, শেক্সপীয়ার তাকে নিয়েছেন লোকগল্প বা নাটকের এতিহ্য থেকে কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন কিং লিয়ার নাটকের বিবেক-কণ্ঠ হিসেবে। ফুল লিয়ারের মনের অন্ধকার বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে। একই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্তব্যের যে চিন্তাটি শেক্সপীয়ারের নিজস্ব (এবং রাজা চতুর্থ ও ষষ্ঠ হেনরিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিচার্ড-কে নিয়ে লেখা নাটকগুলিতে – এবং অন্যান্য ইতিহাস ভিত্তিক নাটকেও – যা প্রতিফলিত) তা সে চমৎকারভাবে বাঙ্ময় করেছে। পাশাপাশি ফুল মানবচরিত্রের, এর উচ্চাশা-দুরাশার বিষয়গুলিকে এবং বিশ্বাস-বিশ্বাসভঙ্গের কারণগুলিকে তার স্বভাবসুলভ চটুল কিন্তু তীক্ষ্ম ভঙ্গীতে চিহ্নিত করেছে।

ফুল যে একটি নিম্নবর্গীয় চরিত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, শেক্সপীয়ার কেন তাকে এতখানি গুরুত্ব দিলেন, এবং একসময় রাজা লিয়ারকে এই চরিত্রটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়তে দিলেন? কারণ হল এই যে, রাজা লিয়ারের সত্য-মিথ্যার তফাৎটি না বুঝতে পারা, প্রশ্নহীন আনুগত্যের প্রশ্নে তাকে কঠোর হওয়া, পিতৃত্বের প্রকৃত প্রকাশটি সম্পর্কে অবগত না হওয়া, এবং ক্ষমতার পুরো বয়ানটি বুঝতে অসমর্থ হওয়া শেক্সপীয়ারের কাছে সরল কোনো বিষয় ছিল না। রেঁনেসাস পরবর্তী মানবকেন্দ্রিক বিশ্বে মানবিক বিচারের এবং মূল্যবোধের যেসব নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছিল সেগুলোর আলোকে লিয়ারের এই অসমর্থতা ও অক্ষমতার প্রকাশটি গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং নতুন এক মানবিক সমাজের অধিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে লিয়ারের চিন্তাবিশ্বটির আমূল পরিবর্তনও কাম্য ছিল। এই পরিবর্তনটি শেক্সপীয়ার ইঙ্গিতে উৎপ্রেক্ষায়, কৌতুক-শ্লেষে যতটা সহজভাবে অনিবার্য করেছেন, বক্তব্যধর্মী সংলাপ অথবা আত্মদর্শী বয়ানে তা ততটা সম্ভব হত না। একই সঙ্গে লিয়ারের অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা – তার সার্বিক ট্র্যাজিক পরিণতিটি – এলিটদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্যে প্রকাশিত হলে হয়তো তার আকর্ষণটা অনেকটা কমে যেত। এজন্যই হয়তো ফুল তার যা বলার তা বলে নাটকের তৃতীয় অংকে হঠাৎ করেই হাওয়া হয়ে যায়। গল্প কাঠামোয় এবং বয়ান নির্মাণের জ্যামিতিতে ফুলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য ততক্ষণে ফুরিয়েছে। তবে যাবার আগে সে যে বলল, এখন দুপুর, আমি দুপুরে ঘুমাতে যাব, তাতে প্রাকৃতিক অবস্থান বা ন্যাচারাল অর্ডার যে উল্টে গেছে, এর মেরামত দরকার, এ কথাটি সে জানিয়ে যেতে ভুলল না। দুপুরে আমাদের দেশে মানুষ বিস্তর ঘুমালেও ইংলন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘুমাতে যাওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়।

শেক্সপীয়ারের অনেক শক্তিশালী, প্রশ্ন উত্থাপনকারী, বিশ্লেষী এবং কেন্দ্রবিযুক্ত চিন্তা যে প্রথাগত পাঠে অথবা শ্রেণী ও ক্ষমতার অবস্থান থেকে সবসময় ধরা পড়ে না, বরং ধরা পড়ে প্রতিচিন্তার অবস্থান থেকে, তা বুঝা যায় তাঁর শেষ দিকের সবচেয়ে পরিপক্ক রচনা দি টেম্পেস্ট নাটকে। নাটকটিকে অনেকে দেখেছেন তাঁর বিদায়ী লেখা হিসেবে, যদিও এর পরও কয়েকটি নাটক তিনি লিখেছেন। তবে দি টেম্পেস্ট এর মতো এতো প্রচন্ডতা নিয়ে সমাজ ও রাজনীতি, শ্রেণী ও শ্রেণীর আধিপত্যবাদ, ব্যক্তি,

পরিচিতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং খুব পরিষ্কারভাবেই, উপনিবেশবাদ নিয়ে শেক্সপীয়ারের চিন্তা ও পর্যবেক্ষণগুলি আর কোনো নাটক প্রকাশ করতে পারেনি। ১৯৭০ এর দশকে প্রধানত ফ্রাঞ্জ ফ্যানন ও এডওয়ার্ড সাঈদ-এর লেখালেখির মধ্য দিয়ে উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্ব একটি ব্যাপক পরিচিতি পায়। যেসব যুক্তি ও অজুহাতকে সম্বল করে শিল্পায়নের ফলে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ানো পশ্চিমের কিছু দেশ প্রধানত সম্পদ ও কাঁচামালের সন্ধানে (পাশাপাশি ধর্মপ্রচার ও স্বদেশে সর্বাংশে বিশ্বাস করা যায় না এরকম মানুষ – যেমন সৈনিক ও প্রশাসক – এবং নিম্নশ্রমে অনিচ্ছুক এবং অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো লোকের ভিন্ন ভূগোলে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে) বিশ্বের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এবং দীর্ঘদিন দমন-পীড়ন-হত্যা লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে শৃঙ্খলিত রেখেছিল, সেসব পরীক্ষা করে, তদন্ত করে, ইতিহাস-রাজনীতি অর্থনীতির নানা বিচারে সেসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্ব বেশ কিছু অভিন্ন উদ্দেশ্যর, সূত্র, কার্যপ্রণালী ও প্রক্রিয়াকে শনাক্ত করেছিল। উপনিবেশ সৃষ্টির পেছনে পশ্চিমের অর্থনৈতিক-সামরিক বিনিয়োগের বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিনিয়োগও ছিল। সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে এসবের এক পূর্বাপর আলোচনা করেছেন এবং অনেকগুলি পর্যবেক্ষণ হাজির করেছেন। উপনিবেশ স্থাপনের পেছনে একটি যুক্তি ছিল এশিয়া-আফ্রিকা ও অন্যত্র পশ্চিমা সভ্যতাকে নিয়ে যাওয়া এবং পশ্চিমের দৃষ্টিতে পুবের যে দুর্বলতা ও অপূর্ণতা ছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব পূরণ করা। শেক্সপীয়ার যখন দি টেম্পেস্ট নাটকটি লেখেন, ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা তখন আমেরিকা ছাড়া অন্য কোথাও উপনিবেশ বসায়নি, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিমাদের উপস্থিতি কোথাও কোথাও ছিল। কিন্তু আমরা যাকে উপনিবেশী শাসন বলে জানি, যার শোষণ ও নিপীড়নের চিত্রটি সর্বত্র প্রায় একইরকম ছিল, তা আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। অথচ ওই নাটকে তিনি প্রসপেরোকে এক সত্যিকার উপনিবেশী শাসক, ক্যালিবানকে উপনিবেশী প্রজা ও প্রসপেরোর জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভাষাকে যথাক্রমে উপনিবেশী শক্তির উৎস, কৌশল ও প্রকাশ বলে উপস্থাপিত করলেন। শেক্সপীয়ার সমালোচনায় দীর্ঘদিন – এমনকি আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ি – প্রসপেরোকে এক বেচারা চরিত্র হিসাবে দেখা হয়েছে, যে রাজা লিয়ারের মতো more sinned against than sinning । এবং ক্যালিবানকে বিবেচনা করা হয়েছে এক অশুভ, বিকৃতমনস্ক, আধা মানব আধা দানব হিসেবে। এই সমালোচনায় প্রসপেরো পশ্চিমা সভ্যতার যা কিছু ভাল ও নৈতিক তার প্রতিনিধিত্বকারী এবং ক্যালিবান পুবের যত অসম্পূর্ণতা এবং বিকৃতিজণিত প্রকাশ তার উপস্থাপনাকারী। অথচ সারা নাটক জুড়ে শেক্সপীয়ার প্রতিচিন্তার জন্য অনেক চিহ্ন এবং খোরাক রেখে দিয়েছেন। উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্বের আত্মপ্রকাশের আগে পশ্চিমা সমালোচকদের সাহিত্য পাঠকে তেমন প্রশ্নবিদ্ধ কেউ করেনি, যদিও সত্তরের দশক থেকে তা সম্পূর্ণ বদলে গেল। আমি আগেই বলেছি, শেক্সপীয়ার তাঁর অনেক প্রথাবিরোধী প্রতিচিন্তার বাহন করতেন নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের।

ক্যালিবান চরিত্রের একটি উত্তর-উপনিবেশি ব্যাখ্যায় যা উঠে আসে তার একটি সারাংশ করলে এরকম দাঁড়ায়:

- ক্যালিবান উপনিবেশী দ্বিত্বতার অবধারিত সূত্র অনুযায়ী সুবিধাবঞ্চিতের দলে, অর্থাৎ সে কালো, সে পুবের, সে অসভ্য, অশিক্ষিত, যুক্তিহীন ইত্যাদি। ক্যালিবানের বিপরীতে প্রসপেরোর অবস্থান এই দ্বিত্বতার সুবিধাপ্রাপ্ত অংশে, অর্থাৎ সে সভ্য, যুক্তিবাদী, পশ্চিমা, কেন্দ্রের, ইত্যাদি।
- ক্যালিবান যুক্তি এবং আলোচনার ধার ধারে না বলে সে বিদ্রোহ করে।
- সে যৌনবিকৃতির এক উদাহরণ এবং এটি তার চরিত্রের এমন এক গঠন-উপাদান যা কোনোকালে পরিবর্তিত হবে না, অর্থাৎ এটি তার জৈবিক ত্রুটি। তার কোনো উদ্ধার নেই।

- ক্যালিবানের মধ্যে ক্ষমা, সহমর্মিতা এসব কোনো গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সে দয়ার মহত্ব বুঝতেও অক্ষম। তার চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতা একটি বড় উপাদান।
- ক্যালিবান জ্ঞান ও জ্ঞানের তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে অক্ষম।
- ক্যালিবানের অস্তিত্ব পুরোটাই জৈবিক। তাতে নৈতিক বা নান্দনিক অনুভূতি বা বিবেচনার অস্তিত্ব নেই।
- অতএব ক্যালিবানের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করাটা প্রসপেরোর অধিকারের মধ্যে পড়ে।

দি টেম্পেস্ট পড়লে আপাতদৃষ্টিতে ক্যালিবানের চরিত্রের এসব বর্ণনা ভুল বলে মনে হবার কারণ থাকে না। প্রসপেরো তার দ্বীপের দখল নেয়ার পর তার সঙ্গে সদাচরণ করেছে, তাকে তার ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। স্নেহ ও দয়া দিয়েছে। তাকে তার ভাষা শিখিয়ে শিক্ষা দিতে চেয়েছে, কিন্তু একসময় ক্যালিবানের যৌনপ্রবৃত্তি জেগে উঠলে সে প্রসপেরোর কন্যা মিরান্ডাকে ধর্ষনের চেষ্টা করে। এই ঘটনার পরই প্রসপেরো তার ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে।

কিন্তু এই সাদামাটা গল্পের আড়ালে শেক্সপীয়ার যে প্রতি-আখ্যান লিখে গেছেন, তা শনাক্ত করে পড়লে দুটি বিষয় পরিষ্কার হবে – উপনিবেশ ও উপনিবেশী প্রকল্পকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে, এর স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর প্রয়াস, এবং খাঁটি নিম্নবর্গীয় ক্যালিবানের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা, যেহেতু তার উপনিবেশ বিরোধী অবস্থানটি তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করেত পেরেছেন।

শেক্সপীয়ার এই প্রতিআখ্যানকে একটি বিপরীত স্রোত হিসেবে তাঁর মূল আখ্যানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শ্রোতটি প্রবল নয়, এজন্য সহজেই তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কিন্তু নাটকের কয়েকটি অংশে এর প্রকাশ দেখা যায়। নাটকের সম্ভবত সবচেয়ে অবাক মুহূর্তে ক্যালিবানকে আমরা স্বপ্ন দেখতে দেখি। তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সে ট্রিনকুলো এবং স্টেফানোকে জানাচ্ছে, সে হঠাৎ হঠাৎ কোনো সুমিষ্ট সুর, বা বাদ্যযন্ত্র শুনতে পায়, মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বরও, এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে। এবং ঘুমিয়ে দেখে, মেঘের দরোজা খুলে আকাশ তার ওপর মণিমুক্তা বর্ষণ করছে। জেগে উঠে সে কাঁদে, যেন সে আবার ঘুমাতে পারে, যাতে ওই সুন্দর স্বপ্নটিতে আবার সে ফিরে যেতে পারে।

দি টেম্পেস্ট নাটকে মিরান্ডা বা ফার্দিনান্দ কেউ এরকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে না। এই স্বপ্নবর্ণনাটি ক্যালিবানের কণ্ঠে জুড়ে দিয়ে শেক্সপীয়ার আমাদের জানান, ক্যালিবানের নান্দনিক উত্তরাধিকারটি প্রসপেরো অস্বীকার করলেও তার আছে। অর্থাৎ যে চরিত্র সুন্দরকে অনুভব করতে পারে – এবং এমন তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে – তার পরিত্রাণ সম্ভব। তাকে অসুন্দর বা বীভৎস বলে বর্ণনা করাটা উপনিবেশী একটি ছকে ফেলে তাকে বিচার করার মতো।

স্টিফানো এবং ট্রিনকুলো প্রধাণত মদিরাচ্ছন্নতার কারণে প্রসপেরোর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, যাতে সক্রিয় ইন্ধন যোগায় ক্যালিবান। এটি তার উপনিবেশ বিরোধি বিদ্রোহও বটে। প্রসপেরো সে খবর তার জাদুবিদ্যার মাধ্যমে জানতে পারে, এবং দুই নিওপোলিটান ষড়যন্ত্রকারীকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু বিভ্রমের সৃষ্টি করে। এক লেবু গাছে হঠাৎ অত্যন্ত দামী কিছু পোষাক দেখে ভাঁড় ট্রিনকুলো স্টিফানোকে বলে, হে রাজা, এই পোষাক আপনাকেই মানায়। ক্যালিবান তা দেখে রেগে যায় – সে

বলে 'ওরে নির্বোধ, এসব আবর্জনা।' যদি দামী পোষাককে ক্যালিবান আবর্জনা বলতে পারে, তাহলে তার চরিত্রে মূল্যবোধের বা নৈতিকতার কোনো জায়গা নেই, এটি কিভাবে বলা যায়।

উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিকেরা উপনিবেশবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বিদ্রোহের কথাও বলেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই ভাষিক বিদ্রোহ বা linguistic insurrection কে উপনিবেশী কেন্দ্রের ভাষাশক্তির (যা জ্ঞান এবং ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত) বিরুদ্ধে এক শক্ত ও কার্যকর বিদ্রোহ হিসেবে দেখেন। প্রসপেরো ক্যালিবানকে তার ভাষা শিখিয়েছে, কিন্তু ক্যালিবান তার মাতৃভাষা ভুলে গেছে। ভাষা যদি ব্যক্তির অস্তিত্বচিন্তার এবং তার সার্বিক পরিচিতির এবং তার সক্রিয়তার একটি হাতিয়ার হয়, তাহলে ক্যালিবান তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সে এক ভাষিক বিদ্রোহের মাধ্যমে এসবের বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রতিবাদ জানায়। এক সময় প্রসপেরোকে সে বলে, তুমি আমাকে তোমার ভাষা শিখিয়েছ, কিন্তু এতে আমার লাভ হয়েছে এই যে, আমি তোমাকে তোমার ভাষায় অভিশাপ দিতে পারি। উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্বে উপনিবেশ সাম্রাজ্যশক্তিকে লিখে জবাব দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে (Empire writes back) ক্যালিবানের ভাষিক বিদ্রোহটি তারও একটি উদাহরণ। প্রসপেরোর শক্তিকেন্দ্রের ভাষা এর আগে এরকম প্রতিরোধের মুখে পড়েনি। এই প্রতিরোধের পর প্রসপেরোর ভাষাতেও অসহিষ্ণুতা এবং অসুন্দর জমা হয়, অর্থাৎ তার ভাষা কিছুটা হলেও স্থিরতা হারায়।

দি টেম্পেস্ট নাটকে ক্যালিবানের কথাবার্তা ও আচার আচরণ থেকে এরকম আরো অনেক উদাহরণ তুলে আনা যায় যা প্রমাণ করে শেক্সপীয়ার উপনিবেশবাদকে মানবতার প্রতি একটি হুমকি হিসেবে দেখতেন। সেই আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ আজকের এই বক্তৃতায় নেই। তবে নিম্নবর্গীয়তার বিষয়ে তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাদের শ্রেণী, বর্ণ, পেশা ও সামাজিক অবস্থানগত সীমাবদ্ধতাগুলি নিয়ে তাঁর যে অনেক প্রশ্ন ছিল, তার একটা প্রকাশ আমরা এই নাটকে দেখি। তবে শুধু দি টেম্পেস্ট নয়, অন্য অনেক নাটকেও তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে তা দেখিয়েছেন।

কিন্তু শেক্সপীয়ার নিম্নবর্গীয়তার চিত্রনে যতটা একনিষ্ঠ ছিলেন, এই অবস্থার কোনো ঊনিশ-বিশ ঘটার ব্যাপারে তিনি ততটা আশাবাদী ছিলেন না। নিম্নবর্গীয়তার অমানবিক প্রকাশগুলি তাঁকে বিচলিত করত, কিন্তু তিনি ধরে নিয়েছিলেন নিম্নবর্গীয়তার অবস্থানটি শ্রেণীচিন্তার ভেতরে একটা অনিবার্যতা নিয়েই আছে। এবং থেকেও যাবে। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়দের জীবন একটা বৃত্তের ভেতরই কাটবে – সেই বৃত্ত ভেঙ্গে তারা যে তাদের জীবনের কোনো উত্তরণ ঘটাবে, বা সামাজিক কোনো সমাবেশ যে সেই লক্ষ্যে সক্রিয় হবে, সেরকম কোনো সম্ভাবনার ছবি শেক্সপীয়ার আমাদের দেননি। অর্থাৎ শেক্সপীয়ার শেষ বিচারে তাঁর শ্রেণী অবস্থানেই থেকে গেছেন।

তবে তিনি যা করেছেন, তা হল, নিম্নবর্গীয়তাকে একটি আখ্যানে বা ডিসকোর্সের ভেতর নিয়ে আসা, যা তাঁর মতো তাঁর সমসাময়িক কোনো নাট্যকার করেননি। এই আখ্যানের ভেতর যুক্তিতর্কের পরিবর্তে সরেজমিনে তদন্ত করা, পর্যবেক্ষণ করা এবং ভেতরদৃষ্টিতে বিষয়টি দেখার একটি তাড়া আছে। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক চিন্তা বা সমাধানের দিকে না গিয়ে শেক্সপীয়ার গিয়েছেন অভিজ্ঞতার দিকে। সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় যাকে ক্ষেত্রসমীক্ষা, ঘটনা-সমীক্ষা বা কেস স্টাডি বলা হয়, তা শেক্সপীয়ার করেছেন। এর ফলে নিম্নবর্গীয়দের চিত্রায়নকে তিনি একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য এবং চমকপ্রদ করেছেন। এই চিত্রায়ন পাঠক-দর্শককে নিম্নবর্গীয়দের প্রচলিত বাক্সে না ফেলে, তাদের নিজেদের শর্তে তাদের দেখতে, বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিম্নবর্গীয়দের চিন্তার ক্ষমতা, ভাষাদক্ষতা, দূরদৃষ্টি,

নান্দনিকতা ও নৈতিকতা, তাদের ছোট-বড় নানা বিদ্রোহ তাদেরকে শ্রেণীবিবেচনার ধরাবাঁধা ছক থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু শেষ বিচারে তারা তাদের অস্তিত্ব, পরিচিতি, পেশা বা জীবিকা, সামাজিক মূল্যায়ন – এসবের বৃত্তের ভেতরেই থেকে যায়। তাদের জীবনের বৃত্তাবদ্ধতার কোনো সমাধান হয় না।

শেক্সপীয়ার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা যদি আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকাই, এবং তাঁর সমতুল্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস-গল্প-নাটক ও কবিতাকে নিম্নবর্গীয়তার প্রেক্ষাপটে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব, তাঁর সাহিত্যেও প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় মানুষের একটা বেশ ব্যাপক উপস্থিতি আছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন, এবং তার গল্প-উপন্যাস-নাটকে প্রচুর চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে, সেসব চরিত্র নিয়ে আলোচনার জন্য বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োজন। পরিসর নেই বলে আমি শুধু কয়েকটি চরিত্রের ওপর আলোকপাত করব। তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন চরিত্রটি জমি হারানো, অধিকার হারানো নিম্নবর্গীয়ের প্রতিনিধি। উপেন স্থানীয় অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে শ্রেণী, বিত্ত ও ক্ষমতার ত্রিমুখী আগ্রাসনের শিকার, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন তার জমি দখলকারী জমিদার। উপেন তার মালিকানা হারানো গাছ থেকে পড়া আমটা কুড়াতে গেলে তাকে নিগ্রহ করে যে মালি, সেও নিম্নবর্গীয়, কিন্তু সে ওই ত্রিমুখী ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী বলে উপেন থেকে তার অবস্থান একটু ওপরে। দক্ষিণ এশিয়ায় নিম্নবর্গীয়তা একটি বিশেষ শ্রেণীতে (অর্থাৎ শ্রেণীর প্রান্তিক বর্গের জনগোষ্ঠি) সমানভাবে প্রকাশিত হয় না, এটি স্থির নির্দিষ্ট এমন কোনো অবস্থান নয়, যাতে সকলেই একই মাত্রার ও মাপের নিম্নবর্গীয়তার শিকার; নিম্নবর্গীয়দের ভেতরেও জাত-পাত বিভেদ আছে, ক্ষমতাহীনতার উনিশ-বিশ বিচার আছে, এবং সেই অনুপাতে সক্রিয়তার ক্ষমতা (বা এজেন্সির) ছিটেফোঁটা দেখা কারো কারো মধ্যে মেলে। নিম্নবর্গীয়তার এই জটিল হিসাব প্রান্তিক মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বড় একটি বাধা, আরো অনেক বাধার সঙ্গে। উপেনের জন্য রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আছে, কিন্তু তার নিম্নবর্গীয়তা নিরসনের কোনো সম্ভাবনা কবিতাটি দেয় না।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পেও নিম্নবর্গীয়দের ভেতর এলিট ক্ষমতার অনুকরণে (এবং খুবই দূরবর্তী, প্রতিফলিত একটি পুণর্নির্মাণে) উচ্চ-নিচ অবস্থানের এবং তা থেকে উৎপাদিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দেখা মেলে। এরকম একটি গল্প 'শাস্তি'। এই গল্পের চার প্রধান চরিত্রের সবাই একেবারে প্রান্তিক। তাদের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রাম শুধু টিকে থাকার। ওই চারজনের মধ্যে দুখিরাম আর ছিদাম দুই ভাই; অন্য দু'জন দুখিরামের স্ত্রী রাধা ও ছিদামের স্ত্রী চন্দরা। একদিন এক কাজহীন দিন শেষে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে হতাশ ও ক্ষুধার্ত দুখিরাম ঘরে খাবার না পেয়ে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীকেই হাতের দা দিয়ে কোপ দিয়ে বসে। স্ত্রী রাধা লুটিয়ে পড়ে চন্দরার কোলে এবং তার মৃত্যু হয়। ছিদাম বুঝতে পারে সত্য প্রকাশ পেলে সে তার ভাইকে হারাবে, আর যদি রাধাকে হত্যার দায়টা তার স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ভাইটা রক্ষা পাবে। স্ত্রী হারাতে তার আপত্তি নেই, কারণ এক স্ত্রী গেলে আরেক স্ত্রী পাওয়া যাবে, ভাই গেলে ভাই পাওয়া যাবে না। এ চারজনের মধ্যে রাধার অনুপস্থিতিতে চন্দরাই প্রকৃত সর্বহারা। দুই ভাইয়ের লিঙ্গ তাদের তার থেকে কিছুটা বেশি সুবিধা দেয়। চন্দরা বুঝতে পারে, তার যা হারাবার সবই সে হারিয়েছে, ফলে সে দায়টা নিজের ওপর নিয়ে দুখিরামের বাঁচার পথ করে দেয়। এই অবস্থান চন্দরা আপনা থেকে বেছে নেয়নি, এটি নিতে তাকে বাধ্য করেছে শ্রেণী ও লিঙ্গ কাঠামো, সমাজের পুরুষ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তার হতদরিদ্র অবস্থা, তার উদ্ধারহীন নিম্নবর্গীয়তা। এই গল্পে বাংলার গ্রামে জমিদারের শাসন এবং প্রান্তিক মানুষের অসহায়ত্বের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তার ওপর রবীন্দ্রনাথ কিছুটা তুলি চালান – চন্দরাকে একটা সমুন্নতি দিতে, অথবা রাধার গলায় কিছুটা শ্লেষ ঢেলে তাকেও একটু মানুষের অবস্থানে নিয়ে যেতে। কিন্তু শেষ বিচারে এই নিম্নবর্গীয়তা এমন এক অন্ধকার সুড়ং-এর মতো যার অন্তে কোনো আলোর রেখা চোখে পড়ে না।

নিম্নবর্গীয়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি সংবেদী চিত্রায়ন হচ্ছে তাঁর চণ্ডালিকা নাটকটি, যার কাহিনীটি তিনি পেয়েছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে লেখা বই থেকে। গল্পটি গৌতম বুদ্ধের প্রখ্যাত শিষ্য আনন্দকে নিয়ে, এবং সংক্ষেপে তা এই: আনন্দ পথ চলতে চলতে পিপাসার্ত হলে একটি কুয়া দেখে থামেন এবং একটি অচ্ছ্যুৎ চণ্ডালীনি মেয়েকে তাকে কুয়ার জল দিতে অনুরোধ করেন। মেয়েটি, যার নাম প্রকৃতি আনন্দকে জল ঢেলে দিতে গিয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার প্রেমে পড়ে যায়। আনন্দকে পাওয়ার জন্য প্রকৃতি তার মা মায়াকে অনুরোধ করে যেন তিনি তাকে জাদু দিয়ে বশ করেন। আনন্দ প্রকৃতির মায়ের শক্তির কাছে পরাস্ত হন। তাকে যখন প্রকৃতি একটা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের একেবারে কাছে নিয়ে যায়, আনন্দ তাকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ জাদুর মায়া কাটিয়ে আনন্দকে মুক্ত করে দেন। এবং প্রকৃতিকে পেছনে ফেলে আনন্দ তার শারীরিক-মানসিক পবিত্রতা বজায় রেখে নিজের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেন।

চণ্ডালিকায় যে নিম্নবর্গীয়তার ছবি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন, তা জাতপাতের, এবং নারীর। প্রকৃতি সমাজের নিচুশ্রেণীর চরিত্র--তার হাতে কোনো উঁচুজাতের মানুষ পানি খাবার কথা ভাবতেও পারে না। তার এই অচ্ছুৎ অবস্থা থেকে আনন্দ তাকে সাময়িক মুক্তি দিলেন, কিন্তু প্রকৃতির মাঝে যখন প্রেম জাগল, এবং প্রেম থেকে যৌনকামনা, এই দ্বিতীয় অবস্থা থেকে আনন্দের পক্ষে তাকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হল না। এইখানে আনন্দের ধর্মাচার এবং নৈতিকতা প্রধান ভূমিকা পালন করল, তিনি নিজেই তার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মুক্তি খুঁজে নিলেন। প্রকৃতি চরিত্রটির প্রতীকধর্মী নাম, এবং তার বৃহত্তর তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে স্থাপন করলে যে মুক্তি তার ঘটে (প্রকৃতি সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করে, লালন পালন করে; প্রকৃতিতে কোনো অস্পৃশ্যতা নেই, তার কোনো জাতপাত বিচার নেই। কিন্তু এই প্রতীকী অবস্থানটি অনেকটা নিরুপায় গরীবের ইচ্ছাপূরণের মতো, এবং আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে একটা আয়রনির ব্যবহার করে বিষয়টিকে তীক্ষ্ণতা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্গীয়তা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিভাবে এর অবসান হবে, সে সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার কোনো ধারণা দেননি; তবে তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায়, তিনি শিক্ষার ওপর, আত্মশক্তির ওপর, চিদমুক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনিও চেয়েছেন সমাজ বদলাক, তবে তার পেছনে ব্যক্তির যতটা, সমাজের ততটা বিনিয়োগ থাকতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন, ফিরে এসে রাশিয়ার চিঠি লিখেছেন। সে বইতে ১৯১৭ পরবর্তী রাশিয়াতে শিক্ষা নিয়ে যে বিপ্লবী চিন্তা হচ্ছিল, কাজ হচ্ছিল, তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদ নিয়ে তাঁর কোনো উচ্ছসিত মন্তব্য আমার চোখে পড়েনি। রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তা কার্যকর ছিল, তার কোনো মূল্যায়ন তাঁর লেখায় পাইনি। ভারতীয় সমাজে এর একটা প্রভাব পড়লে কি হতে পারে, তা নিয়েও ভাবেননি।

সেই তুলনায় কাজী নজরুল ইসলাম অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির একটি উপায় হিসেবে দেখেছেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মোজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। ১৯২০ সালে দু'জন মিলে নবযুগ পত্রিকা শুরু করেন।

১৯২২ সালে নজরুল ধূমকেতু বের করলে মোজাফফর আহমদ 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে সেখানে লিখতেন। নজরুল সক্রিয় চিন্তার ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার মানুষ ছিলেন। সমাজে নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান কি, এবং তাদের পরিত্রাণ কিভাবে হতে পারে, সেসম্পর্কেও তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি নিজেও নিম্নবর্গীয়ের অবস্থানে থেকে জীবন শুরু করেন এবং দারিদ্রের এবং বঞ্চনার সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে যান। ফলে তাঁর কবিতায় উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চরিত্রেরা শ্রেণী অবস্থানগত দিক থেকে শক্তিশালী না হলেও (তারা দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, অধিকারহীন) তাদের অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতায় নজরুলের আকাঙ্খাটি হয়তো প্রতিফলিত, কিন্তু আমরা জানি, নজরুল বিশ্বাস করতেন এই সর্বহারারা একদিন মুক্তির মন্ত্রে জাগবে। এজন্য তাঁর অনেক কবিতায়, অভিভাষণে ও অন্যান্য লেখায় নিম্নবর্গীয়তার রূপায়নটি শুধু প্রান্তিক মানুষজনের বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটাও প্রতিফলিত করে, যে সম্ভাবনার ছবিটা নজরুল দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাঁর সাম্যবাদী (১৯২৫)-র কবিতাগুলি বিশেষ করে 'বারাঙ্গনা', 'চোর-ডাকাত', 'কুলি-মজুর', নারী'; নির্ঝর (১৯৩৮)-এর 'চাষার গান', নতুন চাঁদ-এর 'ওঠো রে চাষী', শেষ সওগাত (১৯৫৮)-এর 'আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন' অথবা 'কৃষকের গান' কবিতায় নিম্নবর্গীয়তার ছবি পাওয়া যায়, তা স্থবির নয়, অনেকটাই সচল। নজরুল সমাজের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরেন, ক্ষমতাকেন্দ্রের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন, এবং বিপ্লবের না হলেও সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ফলে, এসব কবিতায় নিম্নবর্গীয়দের তাদের বৃত্তে বন্দী দেখানো হলেও বৃত্ত ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার একটা উত্তর-উপনিবেশী বিদ্রোহ এবং সবগুলি শেকল ভাঙ্গার একটা আহ্বান তিনি জানান, এবং তা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুল অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে নিম্নবর্গীয়তাকে জানতেন, বুঝতেন; নিম্নবর্গীয়দের বেদনাটা সরাসরি অনুভব করতেন, তাদের ক্রোধ ও বৃত্ত-ভাঙ্গার অভিপ্রায়ের অংশীদার হতেন। রবীন্দ্রনাথ আবেদন রেখেছেন আমাদের যুক্তির, হিতচিন্তার এবং ঔচিত্যবোধের কাছে, নজরুল আমাদের চিন্তা ও কর্মের সক্রিয়তার কাছে, যৌবনের ধর্মের কাছে। শেক্সপীয়ারকে যদি আমাদের আলোচনার এই স্থানে আমরা যুক্ত করি, তাহলে দেখব, নজরুলের অনেক দূরে ছিল তাঁর অবস্থান, বরং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুটা মিল ছিল তার নিম্নবর্গীয়তাবীক্ষণে। তাঁরা দুজনেই নৈতিকতা, ঔচিত্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধে বিশ্বাস করতেন। তবে যেখানে শেক্সপীয়ারের নিম্নবর্গীয় চরিত্রেরা তাদের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দায়িত্ববোধ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে নিজেদের সচল রাখে, জীবন বাঁচায়, প্রচলিত সামাজিক সমীকরণকে ক্রমাগত প্রশ্নবিদ্ধ করে, রবীন্দ্রনাথের নিম্নবর্গীয়রা যেন একটা পূর্বাপর বঞ্চনার ইতিহাসে তাদের স্থাপন করে তাদের সক্রিয়তা হারায়। তাদেরও ক্রোধ, প্রতিবাদ অথবা ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে আমরা দেখি, কিন্তু তাদের অবস্থানের কোনো তারতম্য তাতে ঘটার কথা নয়।

নিম্নবর্গীয়তার সামাজিক বাস্তবতা

সাহিত্য বিপ্লব ঘটায় না, সাহিত্য কোনো কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোও নয়। কিন্তু সাহিত্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, ভাবায়, এবং বৈষম্য, শোষণ, অনাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে। সেজন্য সাহিত্য নানা বৃত্তকে দেখায়, বৃত্ত ভাঙ্গার অনুপ্রেরণাটাও দেয়। আমাদের সময়ে এসে এই বৃত্ত ভাঙ্গার বিষয়টি সাহিত্যে প্রবল হয়েছে, এবং বৃত্তের পরিচয়ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বৃত্ত শুধু নিম্নবর্গীয়তার নয়। বৃত্ত আরোপিত চিন্তার, নানান ভ্রান্ত মতবাদের; লিঙ্গ, বর্ণ, সংখ্যালঘুত্ব ইত্যাদির বিচারে নানা অসাম্যের। এগুলির বিরুদ্ধে এই সময়ের সাহিত্য সক্রিয়। নিম্নবর্গীয়তার রূপও পাল্টেছে। এখন শুধু

কৃষক নয় বরং শ্রমিক, আভ্যন্তরীণ অভিবাসী, ভাসমান মানুষ – অনেককেই এই সংজ্ঞায় আনা হয়, যদিও নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা কৃষকের বাইরে এর সংজ্ঞাকে নিয়ে যেতে চাননি। দারিদ্র ও হতদরিদ্রতার সংজ্ঞাও যেহেতু আধা-দশক পর পর পাল্টায় (মাথাপিছু আয় অথবা সামাজিক উন্নয়ন সূচক ইত্যাদির মাপকাঠিতে) নিম্নবর্গীয়তাকেও এই সময়ের সাহিত্য পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে।

তবে বিচার যাই হোক, নিম্নবর্গীয়তা এখনও একটি প্রকট সামাজিক বাস্তব। এবং এই বাস্তবটি যে কয়েকটি অবস্থান নির্দেশ করে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হল:

- দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন
- অধিকারহীনতা, এবং অধিকারে প্রবেশাধিকারহীনতা
- সামাজিক বর্জন
- সমাবেশ ঘটানোর শক্তির অভাব
- সামাজিক গতিশীলতার উল্লম্ব রেখায় পৌঁছাতে না পারা, এবং আনুভূমিক রেখাটিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া
- ক্ষমতায়নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষি হওয়া
- নিজের কথাগুলি নিজে বলতে না পারা
- বৃত্ত ভাঙ্গার ইচ্ছা থাকলেও সেটি পারার সক্ষমতা না থাকা, এবং আরো ব্যাপক অর্থে, সেই বৃত্তটি নিজেদের চোখে দেখা গেলেও ভাঙ্গার বিষয়টির জন্য অন্যের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করা। আমাদের দেশে এই 'অন্য' বলতে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি বর্তমান, সেগুলিও বৃত্ত নিয়ে অনেক তত্ত্ব ও মতের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে, ভাঙ্গার ব্যাপারটি নিয়ে এই দ্বন্দ্বতো আরো তীব্রই (ভাঙ্গার ব্যাখ্যাও অসংখ্য)।

নিম্নবর্গীয়তার বিষয়টি, দারিদ্রের মতোই, ধ্রুব; কিন্তু ধ্রুবের বাইরে তুলনামূলকও হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে যে নিম্নবর্গীয়, কাল যদি সে তার নিম্নবর্গীয়তা কাটিয়ে একটু ওপরে উঠতেও পারে, দেখা যাবে পরও সমাজের গতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি (যার প্রায় পঁচানব্বই ভাগ যায় ধনীদের ঘরে) ও অন্যান্য নানা সূচকের মাপে তা আবার ওই নিম্নবর্গীয়তাতেই সে নেমে যাবে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রকট বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এই বৈষম্য শ্রেণীগত অবস্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। বিশ্বজুড়ে পুঁজির যে প্রকল্প চলছে, তাতে দারিদ্রকে চিরস্থায়িত্ব দেয়ার একটা উদ্যোগ থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়তার বৃত্ত ভাঙ্গা সহজ কাজ নয়।

কার্ল মার্ক্স-এর মতে পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক যুগ ও সমাজের দিকে যাত্রার প্রধান শর্তটি ছিল ক্ষুদ্র কৃষকের বিলুপ্তি। উপনিবেশ ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি লিখেছিলেন, ইংলন্ড ভারতীয় সমাজের পুরো কাঠামোকেই ভেঙ্গে দিয়েছিল, ওই কাঠামো মেরামতের কাজটা শুরু করা যায়নি। মার্ক্স-এর অভিযোগ ছিল এই যে ইংরেজরা ভারতীয়দের তাদের পুরনো ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করেছে। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ভারতের গ্রাম না ধরে রাখতে পেরেছে তার সমবায়ী কাঠামো, না পা ফেলতে পেরেছে শহরকেন্দ্রিক নতুন কাঠামোর ভেতরে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনেক লেখায় বাংলার গ্রামের মৌল কাঠামোর – যাতে প্রতিদিনের দিনযাপন থেকে নিয়ে সার্বিক ব্যবস্থান, সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল – বিলুপ্তির জন্য আক্ষেপ করেছেন। ইংরেজরা যে জাতীয়তাবাদ ভারতীয়দের এবং ভারতের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল – পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে যার প্রাবল্যকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় সমালোচনা

করেছেন – তার প্রভাবে জীবনযাপন ও ঐতিহ্যের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে ও নানাধরণের রাজধানীগুলিতে (প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক) চলে গেল। এই পরিবর্তনে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হল ক্ষুদ্র চাষী। তারা মাঝে মাঝে একত্র হয়ে প্রতিবাদ বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু সেসব নিয়ন্ত্রণে আনা কেন্দ্রের জন্য মোটেও কঠিন হয়নি। মার্ক্স বারে বারে যে কথাটির ওপর জোর দিতেন, তা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে, তাঁর মতে, শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। কৃষকের জন্য – এবং তার পর দৃশ্যপটে আসা কলকারখানার শ্রমিকের জন্য – শ্রেণী সংগ্রামের প্রধান রূপটি ছিল অসংগঠিত, মাঝে মধ্যে তা সংগঠিত হলেও ভেতর ও বাইরের নানা প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় তা কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। অথচ এই কৃষক ও শ্রমিকেরা 'আধুনিক' সমাজ সৃষ্টির পেছনের প্রধান কারিগর। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস প্রকল্প এই কারিগরদের বয়ানগুলি একত্র করে, তাদের নিয়ে গবেষণা চালিয়ে ইতিহাস থেকে প্রায় মুছে ফেলা এই শ্রেণীটিকে তার সক্রিয়তা-ক্ষমতা বা এজেন্সি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। এই প্রকল্প প্রমাণ করতে চেয়েছে, বিশেষত কৃষক শ্রেণীটি, আধুনিকতার সমান্তরাল ছিল, এবং তারাই তাদের ইতিহাস রচনা করে গেছে। সেই ইতিহাসটি পুনরুদ্ধার করা গেলে ইতিহাস পাঠটাই বদলে যাবে।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মার্ক্স থেকে, হেগেল থেকে। তারা নিম্নবর্গীয়দের রাজনৈতিক শ্রেণীতে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্ক্স যেমন বলেছিলেন, পুঁজির যুগেও বুর্জোয়ারা নয়, সর্বহারারাই সর্বজনীন শ্রেণী, ভবিষ্যতের প্রতীক। ফলে জীবনে ও চিন্তায় নিম্নবর্গীয়রা অগ্রগতিকেই ধারণ করে। হেগেল তাঁর ফেনোমেনোলজি অফ স্পিরিট গ্রন্থে প্রভুত্ব ও দাসত্বের (মুনিব-দাস বর্ণনাতেও যা পরিচিত) দ্বান্দ্বিকতাতেও চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণে মুনিব থেকে দাসের সক্ষমতাটা যে বেশি তা উল্লেখ করেছেন, এবং ইতিহাস যে দাসের পক্ষে থাকতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস প্রকল্প সমসাময়িক ইতিহাস চিন্তাকে একটা নতুন পথে নিয়ে এলেও এটিকে কোনো মহাসড়কে রূপ দিতে পারেনি। এই প্রকল্পের চর্চা এখন বিচ্ছিন্নভাবে চলছে। ফলে ভারত-বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয়তার চিত্রটি একটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে এর একটি শক্তিশালী ডিসকোর্স তৈরি করলেও এটি অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে যারা ভাবেন, এবং, জরুরিভাবেই, নিম্নবর্গীয়দের ভেতরেও এই নতুন চিন্তাটি তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সাহিত্যে যেমন, নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চাতেও তেমন, চিত্রায়নটা আছে, কিন্তু পরিবর্তনটা নেই। ঘুরে ফিরে মার্ক্সের 'বদলে দেয়ার' উদ্যোগটি এখনও নেয়া হয়নি। যারা পারত, সেই রাজনৈতিকভাবে সুসংহত সমাজতান্ত্রিক কম্যুনিস্ট সংগঠনগুলিও এখন দৃশ্যপটে নেই। তাই বলে কি নিম্নবর্গীয়রা তাদের বৃত্তেই বন্দী থাকবে? এর উত্তর হয়তো ভবিষ্যৎ দেবে। অথবা তারা নিজেরাই দেবে।

EAST WEST UNIVERSITY

A/2, Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City
Aftabnagar, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: 09666775577, 9858161
E-mail: admission@ewubd.edu
URL: http://www.ewubd.edu